নায়ক একাকী

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১৩৬৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীদিলীপ কুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

আট টাকা

আমার মায়ের স্মৃতিতে

—গৌরাঙ্গ

প্রকাশক :

"নায়ক একাকী" প্রসঙ্গে দু'চার কথার অবতারণা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার্য, এ উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র আমার কল্পনার মাটিতে বোনা ফসল নয়।

আমাদের চারপাশে প্রতি মুহূর্তে যাঁদের চলতে-ফিরতে দেখি, অথবা যাঁরা এখন আমাদের চোখের আলোর বাইরে, তাঁদের মধ্যে কচিৎ কদাচিৎ এমন দু'একজনকে আমরা দেখি বা জানি, যাঁরা মনের পর্দায় প্রতি মুহূর্তের জন্য 'বিগ ক্লোজ আপ'-এর মত স্পষ্টতর হয়ে ভেসে থাকেন। তেমনি একজন মানুষ আমার এই কাহিনীর নায়ক।

'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর'-এর মত আমি এই মানুষটির সব কথা খুঁজে খুঁজে বার করে, আমি আমার একান্ত নিজের ভাষায়-সাহিত্যের আবরণ দিয়ে সাজিয়েছি মাত্র। নায়কের নাম অমর। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের বা শিল্পের শাখা-প্রশাখা, লতা আর পাতায় অমর দত্তের গোটা জীবনের বিচিত্র কাহিনী ছড়ানো। আমি অমর দত্তের কর্মময় জীবনটাকে যদি একরাশ ফুল ভাবি, তবে সে ফুল কুড়িয়ে এ আমার মালা গাঁথার চেষ্টা।

অমর দত্তের জীবন নিয়ে উপন্যাস, একে জীবনী হিসেবে আখ্যায়িত করার দুঃসাহস আমার নেই। বরং বলা ভাল, একটি সদা জাগ্রত কর্মীর অশ্রুস্নাত জীবন-কাব্য এই নায়ক একাকী।

যদিও ইতিহাস-আশ্রিত, তবু এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া বৃথা হবে।

'প্রসাদ' পত্রিকার কর্ণধার-সম্পাদক প্রণবকুমার বসু এই কাহিনী 'প্রসাদ' পৃষ্ঠায় তুলে ধরে অমর দত্তের প্রতি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সহযোগী সম্পাদক প্রণব বিশ্বাসের সহযোগিতা স্মরণীয়।

প্রকাশক :

এই কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করে দে'জ পাবলিশিং-এর পক্ষে বন্ধুপ্রতীম সুধাংশুশেখর দে আমাকে আমার জীবনের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিলেন বলে আমি কৃতার্থ। অমর দত্তের জীবন-ইতিহাসবেত্তা শ্রীরমাপতি দত্ত ওরফে হরীন্দ্রনাথ দত্তের কাছেও আমার অনেক ঋণ রইল। অমরেন্দ্রনাথের জন্ম

শতবর্ষপূর্তিতে তাঁর প্রতি স্মরণে, মননে আমার এই অর্ঘ্য উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। জীবনে অমর, কর্মে অমর, নামে অমরেন্দ্রনাথ, তাঁকে প্রণাম।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

নায়ক একাকী

প্রকাশক

বজরাটা চলছিল। এতটুকুও দুলছিল না। অচঞ্চল। গতি ছিল ডায়মণ্ড হারবারের দিকে! নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলবার জন্য নৌকোবিহারের ব্যবস্থা। রীতিমত বিরাট আয়োজন। নিজেকে সুস্থ করে ফিরে যাবার পর যে নাটক খোলা হবে তারই প্রথম দৃশ্যের মহলা চলছিল বজরার খোলা পাটাতনে। সাজানো আসরে।

এ সব ডাক্তারের নির্দেশ। তখনকার দিনের বিখ্যাত ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করে কেবলমাত্র কতকগুলো ওষুধের ব্যবস্থাই করেননি, বলেছিলেন, আমি ঠিক ভাল বুঝছি না, এই জীবন থেকে যেমন করেই হোক ওকে নিয়ে যেতে হবে আর এক জীবনে।

ধীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে কী জীবন?

ডাক্তার রায় দিয়েছিলেন, নৌকোবিহার। রুগীকে বেশ কিছুদিন উন্মুক্ত বাতাসে রাখা দরকার, তাহলে দেখবেন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। শুধুমাত্র নিরস নৌকোবিহার নয়, রুগী যা যা ভালবাসে তার সব কিছুই থাকবে সেখানে।

তাই হয়েছিল। বজরার সাজানো আসর তবলা, হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট আর বেহালার মিলিত মূর্ছনায় বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। দেশীয় বাজনার তালে তালে এগিয়ে যাচ্ছিল বজরাটা।

এক বাঈজীর গজল্ দিয়ে নাটকের শুরু। বাঈজী গাইছিল। গানের চূড়ান্ত মহলা চলছিল বজরার ওপরে। এক রমণীয় পরিবেশ।

অপূর্বদর্শন গালিচার ওপরে কয়েকজন পার্শ্বচর বেষ্টিত অমরেন্দ্রনাথ বসে আছেন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। তাঁর দৃষ্টি ছিল আকাশের বুকে। চলমান বজরার সংগে সংগে যেন আকাশটা চলছিল।

তাকিয়ে ছিলেন সেই চলমান নীল আকাশের দিকে। হঠাৎ একটু বাতাস খেলা করে গেল। দুলে উঠল বজরাটা। সেই সংগে

অমরেন্দ্রনাথের ক্ষীণ দেহটাও দুলে উঠল। অমরেন্দ্রনাথ আকাশ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বাঈজীর ওপরে রাখলেন। ভাল লাগছিল না। ভিতরকার একটা অস্বস্তি ওঁর চোখে মুখে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অমরেন্দ্রনাথ এবার চোখ বুজলেন।

বাঈজীর গজল্, তবলার বোল আর পার্শ্বচরদের নেশার পেয়ালার ঠুং ঠাং শব্দ বারবার যেন গোটা অমরেন্দ্রনাথকে চাপা দিতে চাইছে। চাপা একটা যন্ত্রণায় তিনি যে কতখানি কাতর সে খবর রাখবার অবকাশ ছিল না কারও। একটা হাত দিয়ে বুকটা শক্ত করে চেপে ধরলেন অমরেন্দ্রনাথ। বার কতক কাশলেন। কাশির আওয়াজ গজলের পরিপূর্ণতাকে ছাপিয়ে যেতে পারল না। সবাই যেমন ছিল তেমনি থেকে গেল। কেবল অমরেন্দ্রনাথ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। যে রুমাল দিয়ে কাশবার সময় মুখ চাপা দিচ্ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ, সবার দৃষ্টির আড়ালে আস্তে করে সেই রুমালটা ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে। রুমালটা দুলে দুলে ঢেউ আর স্রোতের আঘাতে আঘাতে একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে থাকল। অমরেন্দ্রনাথের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া বুকের রক্ত ধুয়ে যেতে থাকল গঙ্গা জলে। এবার নিজেকে কোন মতে সামলে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন অমরেন্দ্রনাথ, রিহার্সাল শুরু কর—

গজল্ থামল। শুরু হলো সংলাপ। অমরেন্দ্রনাথ আজ নীরব দর্শক। তাকিয়া হেলান দিয়ে মানুষটি এমনভাবে বসেছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি মৃতদেহ। হয়তো তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর শেষ হয়ে যাবার আর দেরি নেই। কাশতে কাশতে দম আটকে আসছিল তাঁর। অসহ্য যন্ত্রণায় গোটা মানুষটা যেন কুঁকড়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার একটা রুমাল ভিজে গেল অমরেন্দ্রনাথের বুকের রক্তে। বুকটাকে চেপে ধরে কাশতে কাশতে বললেন, তোমরা কে আছ—বজরার মুখ ঘোরাতে বল—

তারপর ক্ষীণ স্বরে বললেন, অনেকদিন আগে আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছিলাম, যেদিন আমার জীবনের গতি থেমে যাবে ঠিক সেই দিন আমি তার কাছে ফিরে যাব। আজ সেই দিন। দোহাই তোমাদের, বজরার মুখ ঘোরাও—

বজরার মুখ ঘুরল। গতি পরিবর্তিত হলো। যে বজরা মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই বজরা মুহূর্তের মধ্যে দুরন্ত হয়ে উঠল। একটা মৃতপ্রায় মানুষকে বহন করে বজরাটা ছুটে চলল আর এক মৃত্যুর দিকে।

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত অবস্থায় ওপর থেকে নেমে এলেন ডাক্তার।

ডাক্তারবাবুর পাশাপাশি নামলেন ধীরেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ। নীচে নেমে এসে ধীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারের মুখে ভাষা নেই। হীরেন্দ্রনাথ বললেন, আমরা কী ভয়ঙ্কর ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি বুঝতে পারছেন ডাক্তারবাবু?

হীরেন্দ্রনাথের মুখ থেকে বাকি কথাগুলো কেড়ে নিয়ে ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, ডাক্তারবাবু, বৌমাকে আপনি বাঁচান, তা না হলে আমরা কি জবাবদিহি করব? দয়া করে বাঁচান বৌমাকে—ডাক্তার বললেন, আমি আন্তরিক দুঃখিত ধীরেনবাবু, আমার সাধ্য কি আপনার বৌমাকে ফেরাই—বোধহয় এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে—

ধীরেন্দ্রনাথ আর হীরেন্দ্রনাথ পাগলের মত ছুটে ওপরে উঠে এলেন। যে ঘরে হেমনলিনী এতক্ষণে মরে পড়ে আছে বলে ধীরেন্দ্র ও হীরেন্দ্রনাথের ধারণা সেই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন ওঁরা।

একটা ভয়। ভয় এ-বাড়ির ছোটবৌ হেমনলিনীকে নিয়ে। হেমনলিনী মারা গেছে না এখনো বেঁচে আছে!

হেমনলিনীর জীবনটা অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তা যায়নি। হেমনলিনীর জীবনটা বেরিয়ে যেতে গিয়েও যেন যেতে পারছে না। কিন্তু এখনি হেমনলিনী মারা যাবে কেন? যে বয়সে বাঁচবার স্বাদ নিয়ে একরাশ হাসি খুশি নিয়ে মানুষ ছুটে চলে, সেই বয়সে হেমনলিনী মারা যাবে কেন! যে বয়সে মেয়েরা সংসার সাজায়, সাজানো সংসারে স্বামী সন্তান নিয়ে হাসিতে খুশিতে ভরে থাকে, ঠিক সেই বয়সে হেমনলিনী কেন সব কিছু ছেড়ে চলে যাবে? এর পিছনে একটা কারণ আছে। সব মৃত্যুর পিছনেই একটা কারণ থাকে। থাক এখন সে সব কথা।



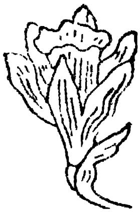
প্রসঙ্গ এলেই নিজেকে আর সামলে রাখতে পারতেন না। হাসতে হাসতে হাঁটুর ওপরে হাতের তালু ঘষতে ঘষতে মাঝে মাঝেই অমরেন্দ্রনাথ বলতেন, আমি থিয়েটার করব না তো কে করবে?

কথাটা তিনি এমন ভাবে ছুঁড়ে দিতেন তাতে সবারই ধারণা হতো থিয়েটারের প্রতি অমরেন্দ্রনাথের একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি আরও বলতেন, কথাটা শুনে তোমরা হয়তো ভাবছ, এ তোমাদের কালুর অহংকার! তোমরা হয়তো ভাবছ তোমাদের কালু এই অভিনয় ব্যাপারটাকে পৈতৃক সম্পত্তি ঠাওরেছে! না হে না, পৈতৃক সম্পত্তি ঠাওরালে কি কথাটা এত গর্বের সঙ্গে বলতে পারতুম? পারতুম না। থিয়েটারের নেশায় একদিন যেমন করে পৈতৃক সম্পত্তি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, তেমনি করেই এই

ব্যাপারটাকেও উড়িয়ে দিতুম। গোড়াই বলতে যেতুম, থিয়েটার আমি করব না তো কে করবে!

থিয়েটার তো অনেকেই করে, থিয়েটার-থিয়েটার করে গোটা জীবনটাকে মাটি করে দেয় অনেকেই, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ কেন এই ব্যাপারটাকে এত প্রাধান্য দিতেন?

তিনি হাসতে হাসতে বলতেন, কথাটা এত জোর দিয়ে কেন বলছি তা তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে, অথচ কেউ তোমরা আমাকে ঘাটাতে চাইছ না, এটাও তোমাদের এক ধরনের স্তাবকতা, তা হোক, তবু আসল গল্পটা তোমাদের খুলে বলি, কি বল—



এই কলকাতার নাম তখনো শুধুমাত্র 'কলিকাতা' হয়নি। ইংরেজদের রাজত্ব বটে, তবুও সেই রাজত্ব তখনো বেশ পাকাপোক্ত কায়েমী রাজত্ব হয়ে ওঠেনি। কোন এক বাড়ির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা যখন তল্পী তল্পা নিয়ে এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে উঠে আসে তখন তাদের অবস্থা যেমন থাকে, তেমনি অগোছাল, খাপছাড়া, সব থেকেও কিছু না থাকার মতো অবস্থা ছিল তখন ইংরেজদের।

এখন যেখানে ফোর্ট ঠিক সেইখানটা কেবল নয়, তার আশপাশ জুড়ে ছিল গোবিন্দপুর। আর সেই গোবিন্দপুরের আদি বাসিন্দা বলতে দত্তদের বোঝাত। দত্তরা বেশ ভালই ছিল গোবিন্দপুরে। ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবন, সুখ-দুঃখ ভালবাসা, কত উত্থান আর পতন সব কিছু নিয়ে গোবিন্দপুরের কায়েমী বাসিন্দা দত্তরা বেশ ভালই ছিল।

হঠাৎ একটা ঘূর্ণীঝড় এসে আছড়ে পড়ল গোবিন্দপুরে। স্বার্থের ঝড়। কেঁপে উঠল গোবিন্দপুরের মানুষরা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

হঠাৎ নোটিশ জারী করে বসল যে সকলকেই এই গোবিন্দপুর ত্যাগ করতে হবে। আসলে বাস্তু ত্যাগী হতে হবে এখানকার অধিবাসীদের।

অপ্রত্যাশিত এক বিরাট সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়াল গোবিন্দ-পুরের সকলে। একটা হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল গোটা গোবিন্দপুরে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেতনভুক কর্মচারীদের তাতে কিছু এল গেল না। কোম্পানির নির্দেশে লোকগুলো যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সহজভাবে যদি কেউ গোবিন্দপুর ছেড়ে চলে না যায়, গোবিন্দপুরে ইংরেজদের যে কোর্ট বসবে, যদি কেউ গায়ের জোরে তার প্রতিবন্ধক হয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের রেহাই দেবে না—সে কথাও কোম্পানির লোকেরা জানিয়ে দিয়ে গেল। এগিয়ে এল গোবিন্দপুরের অন্তিম সময়। গোবিন্দপুরের অস্তিত্ব বিলুপ্তির লগ্ন এসে গেল। শুরু হলো মহাপ্রলয়। ঘর ভাঙার স্রোত বইতে লাগল। কোম্পানির লোকেরা গোবিন্দপুরের অনেকেরই বসত বাড়ি দখল করে বসল।

কোম্পানির এই অন্যায় অধিকার বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বসলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। দত্ত বংশের মূল লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুরন্ত প্রতাপ জেনেও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন, গোবিন্দপুরবাসীরা নিতান্ত শূন্য হাতে কোম্পানির রাঙা চোখ সম্বল করে সব কিছু ছেড়ে পথে এসে নামবে না। বাস্তুত্যাগের বিনিময়ে সকলেই কোম্পানির কাছ থেকে কিছু না পেলে, জীবন দেবে, কিন্তু বাস্তুহারা হবে না। লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের সঙ্গে সকলেই হাত মেলালেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নিল।

কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলে দত্তদের একখণ্ড জমি দিয়েছিল কোম্পানি। তারপর থেকে সব শেষ। গোবিন্দপুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত চলে এলেন তিরাশী নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে। তারপর সেই একখণ্ড জমির ওপরে উত্তরসূরীদের জন্য তিনি গড়ে তুললেন আর একটা নতুন বাড়ি।

সেই সঙ্গে ধার্মিক, উদার এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত দত্তবংশের একজন কৃতীপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন।



সব ছিল দত্তপ্রাসাদ অলিন্দে। চণ্ডীমণ্ডপে মহা ধূমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা হতো। গঙ্গায় জোড়া নৌকোয় প্রতিমা বিসর্জন হতো। নাটমন্দিরের সামনে বসত যাত্রা গানের আসর। কলকাতার অনেক শখের নাট্কে দল দত্তপ্রাসাদ অঙ্গনে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার করে যেত। আসলে সবাই জানত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের কোন অভাব ছিল না। ক'জনই বা লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর ভিতরকার খবর রাখত ? তিনি নিজেও জানতেন, সবই তাঁর আছে তবু যেন কিছু একটা নেই। কোথায় যেন কিসের একটা অভাব মানুষটাকে মাঝে মাঝেই ভাবিয়ে তুলত। ভাবনা দ্বারকানাথকে নিয়ে।

ছেলেবেলা থেকেই দ্বারকানাথ ছিলেন ঠিক বাবার মতো। যেমন একরোখা তেমনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দত্তবংশের প্রাচুর্য আর বনেদীয়ানাকে সম্বল করে চলতে তিনি কোনদিনও প্রস্তুত ছিলেন না। যুবক দ্বারকানাথের তাই বোধ করি ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েতে একটা চাকরি নিতে বেগ পেতে হয়নি বেশী। চাকরি পেয়েছিলেন টাইম টেব্‌ল্ ডিপার্টমেন্টে।

চাকরি করছিলেন বটে দ্বারকানাথ, কিন্তু কিছুতেই যেন নিজেকে সেখানে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। কিছুদিন চাকরি করার পর স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি, জন্মজন্মান্তর এই চাকরিতে বহাল থাকলেও জীবনের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। হঠাৎ শুনতে

পেলেন নতুন চাকরি একটা পাওয়া যেতে পারে। বড় পদ, সম্মানীয় চাকরি। অপেক্ষা না করে আর পাঁচজন প্রার্থীর মতো দ্বারকানাথও সেই 'মুৎসুদ্দি' পদের জন্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত রেলী ব্রাদার্সের বড় লোভনীয় পদ সেই মুৎসুদ্দি।

রেলী ব্রাদার্সের সাহেবরা বড় বিচক্ষণ। তারা তহবিলকে স্ফীতকায় করতে চাইল। ঘোষণা করল এক লক্ষ টাকা যে জমা দিতে পারবে তাকেই বহাল করা হবে চাকরিতে। খবরটা দ্বারকানাথের কানে গিয়ে পৌঁছল। আগেই বলেছি, রেলী-কোম্পানীর চাকরিতে মন বসাতে না পেরে দ্বারকানাথ ভিতরে ভিতরে অশান্তির আগুনে জ্বলছিলেন। রেলী-কোম্পানীর এই খবরে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না তিনি। আগু-পিছু কোন ভাবনা চিন্তা না করে রেলী-কোম্পানীতে হাজির হলেন দ্বারকানাথ। মুহূর্তে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়ে সবার মুখ থেকে ছিনিয়ে নিলেন চাকরিটা। সেই দ্বারকানাথ হলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের ছেলে। সামান্য ক'টা দিনের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে দ্বারকানাথ হয়ে উঠলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বারকানাথেরই জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের যত ভাবনা। উপযুক্ত ছেলেকে সংসারে উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যেতে পারলে যেন তিনি স্বস্তিতে মরতে পারেন।

দ্বারকানাথকে ঘিরে যখন লক্ষ্মীনারায়ণ একরাশ দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছিলেন ঠিক তখনই এল রক্ষাকালীর খবর। লক্ষ্মীনারায়ণ বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে বাগবাজারের বর্ধিষ্ণু-ধনাঢ্য বসু পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতালেন। বেশ জাঁকজমক করে উপযুক্ত ছেলে দ্বারকানাথের বিয়ে দিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। বসু পরিবারের একমাত্র আদরের দুলালী রক্ষাকালীকে স্ত্রী-রূপে বরণ করে নিয়ে এলেন দ্বারকানাথ চোরবাগানের বাড়িতে। তারপর এক সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বিরাট অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

একান্নবর্তী পরিবারে দ্বারকানাথ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। বাড়ির অন্য পুরুষেরা রোজগারী ছিলেন না তা নয়, কিন্তু দ্বারকানাথের

আর্থিক স্বচ্ছলতা বোধ করি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। আর তাঁর ওপরেই ছিল বিরাট সংসারের হাল ধরার দায়িত্ব। তবুও এ কথা সত্যি যে সংসারে দ্বারকানাথ বেশী রোজগারে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও গোটা বাড়িতে তাঁর কোন আধিপত্য ছিল না। দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন এ সংসারে তাঁর প্রয়োজন শুধু অর্থের তাগিদে। সেই কারণে দ্বারকানাথ কাজ থেকে ফিরে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকতেন, একান্ত প্রয়োজন না হলে আর ঘরের বাইরে আসতেন না তিনি। নিজেকে যেন গুটিয়ে রাখবার চেষ্টা।

তবুও সুখেই ছিলেন দ্বারকানাথ। মা হয়েছিলেন রক্ষাকালী। ছেলেমেয়েদের বুকে নিয়ে সদাহাস্যময়ী রক্ষাকালী যখন আনন্দে-খুশিতে টলমল করছিলেন ঠিক তখনই কোন্ এক অভিশাপের ফলে মায়ের কোল শূন্য করে মাত্র ক'টা দিনের ব্যবধানে চলে গেল পর পর দুই মেয়েই। আকস্মিক এই চরম আঘাতে দ্বারকানাথের মন ভাঙল, রক্ষাকালী প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন। এর অনেকদিন পর কালু এল রক্ষাকালীর পেটে। সেই কালুর জন্মক্ষণ নিয়ে বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটেছিল দত্ত বাড়ীতে। কি সেই ঘটনা তাই বলা দরকার এবারে।

দ্বারকানাথ একটু তাড়াতাড়ি ফিরলেন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়েই দ্বারকানাথ যখন অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর নিজস্ব জুড়িগাড়িতে উঠছিলেন তখন একজন প্রশ্ন করেছিল, কী ব্যাপার দ্বারকা, আজ তোমাকে এতটা খাপছাড়া দেখাচ্ছে কেন ?

দ্বারকানাথ বলেছিলেন, আমার স্ত্রীর শরীরটা ক'দিন ভাল নেই—

কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে দ্বারকানাথ সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। শ্বশুর বাড়িতে যাবার তাড়া দ্বারকানাথের।

রক্ষাকালী কিছুদিন হলো বাগবাজারে তাঁর বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। এই সময়ে বাপের বাড়িতেই থাকতে হয়। রক্ষাকালী অন্তঃসত্ত্বা। খবর এসেছে রক্ষাকালী অন্যদিনের তুলনায় আজ একটু বেশীমাত্রায় অসুস্থ। তাই দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সোজা হাজির হয়েছিলেন বাগবাজারে শ্বশুরালয়ে।

যে মন নিয়ে দ্বারকানাথ সারাদিন ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়েছিলেন, এ বাড়িতে এসেই মুহূর্তে তাঁর মনে একটা স্বস্তির দোলা লাগল। গোটা বাড়িটা আজ আনন্দমুখর। জানা গেল বাগবাজারের কয়েকজন নাটুকে ছেলে আজ বোস বাড়ির প্রাঙ্গণে 'সধবার একাদশী' নাটক করবে। তারই প্রস্তুতি চলছিল প্রাঙ্গণে।

দ্বারকানাথ শ্বশুর বাড়ীর অন্দরমহলে প্রবেশ করে প্রথমেই দেখা করলেন রক্ষাকালীর সঙ্গে। সন্ধ্যা নামতে না নামতেই রক্ষাকালী হাসিখুশি মনে যেন স্বামীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ, এমন একটা অভিব্যক্তি খেলা করে গেল রক্ষাকালীর চোখে-মুখে। দ্বারকানাথ সকলের চোখ এড়িয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ? রক্ষাকালী মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, এখন ভাল—

ওদিকে অভিনয়ের সময় এসে গেল। বাড়ির অন্যদের সঙ্গে রক্ষাকালীও প্রস্তুত হলেন থিয়েটার দেখতে যাবেন নিচের তলায়, ঠাকুর দালানে। উপর থেকে নিচে নেমে থিয়েটার দেখতে হবে চিকের আড়ালে বসে। রক্ষাকালী সেই নিচে নামবার জন্য তখন এক পায়ে খাড়া।

যথা সময়ে শুরু হলো কনসার্ট। নাটক শুরু হবার আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। হঠাৎ রক্ষাকালীর চোখে মুখে একটা চাপা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল। কিছু প্রকাশ করলেন না রক্ষাকালী। পাছে

সব আনন্দ মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় এই আশঙ্কায় রক্ষাকালী যন্ত্রণা চেপে রেখেই এসে বসলেন চিকের আড়ালে।

গোটা বাড়িটা যন্ত্রমূর্চ্ছনায় মুখর হয়ে উঠল। সকলের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের যবনিকার ওপরে। রক্ষাকালী কিন্তু নিজেকে আর স্থির করে রাখতে পারলেন না। সুতীব্র যন্ত্রণায় হঠাৎ তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। যন্ত্রমূর্চ্ছনা যখন সব কিছু ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই সুতীব্র যন্ত্রণায় কাতর, ঘর্মাক্ত রক্ষাকালী নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারলেন না, লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কিন্তু সে যন্ত্রণার সুর যন্ত্রসংগীতের সুরকে ছাপিয়ে যেতে পারল না। মঞ্চের কেউ জানতে পারল না, চিকের আড়ালে অকথিত যন্ত্রণায় এক মধুর মুহূর্তের আমন্ত্রণ। সকলে ধরাধরি করে রক্ষাকালীকে নিয়ে এলেন অন্দরে।

ওদিকে ধীরে ধীরে যবনিকা উঠতে লাগল। থিয়েটারের যবনিকা সম্পূর্ণ উঠে যাবার আগেই বোস বাড়ির অন্দরমহলে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। বেজে উঠল শঙ্খ। রক্ষাকালী প্রসব করলেন আর এক পুত্র সন্তান।

যথাসময়ে ছেলের নাম রাখা হলো অমর। অমরেন্দ্রনাথ। আদর করে সবাই তাকে ডাকে কালু।



সংসারে সব মানুষ এক হয় না।

হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন কোনদিন কোন অবস্থাতেই সমান নয়, তেমনি একটি মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের মিল খুঁজতে যাওয়াও বোধ করি বৃথা চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য অনেক সময়

আবার একটা মানুষের সঙ্গে আর একজনের দেহগত অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বারকানাথের সংসারে এই কালুর সঙ্গে কারও কোন মিল তো ছিলই না বরং এই পরিবারের ছেলে বলে তাঁকে ভাবাই যেত না। তবুও কালু ছিল সবার চোখের মণি। কালুকে ছুঁয়ে কথা বলার উপায় ছিল না কারও।

বড়দা ধীরেন্দ্রনাথ আর মেজদা হীরেন্দ্রনাথ সংসারে যতখানি শান্ত, অমরেন্দ্রনাথ ঠিক ততখানি দুরন্ত। ছেলেবেলায় অনেকেই দুরন্ত থাকে, কিন্তু কালুর দুরন্তপনা ছিল ভিন্ন জাতের।

চোরবাগানের বাড়িতে সেবার যাত্রা গানের আসর বসেছিল। বাবার কোলের কাছে বসে বালক কালু সেই যাত্রা পালা দেখছিল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

যে-সময়ে একটা শিশুমনে সংসার আর সেই সংসারের চরিত্র-গুলির কোন ছবিই আঁকা হয় না, সেই সময়ে সেই শিশু মনেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যটি একটা আতঙ্কের ছাপ ফেলেছিল।

দুঃশাসন যখন জোর করে দ্রৌপদীর বস্ত্র কেড়ে নিচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে বালক কালু তার বাবার একটা হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, বাবা!

আট বছরের কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ! কচি কণ্ঠের সোচ্চার প্রতিবাদে সেদিন যাত্রাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঝকমকে পোশাক পরা দুঃশাসন রূপী অভিনেতা আসর ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল কালুর কাছে। দ্বারকানাথের কাছে দাঁড়িয়ে কালকে উদ্দেশ্য করে বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল, না না খোকাবাবু, এ আসল নয়, নকল। এ তো থিয়েটার! তারপর থেকেই কালুর যত দুরন্তপনা ঐ থিয়েটার নিয়ে।

দিন যত যায় ঐ থিয়েটার যেন কালুকে ততই পেয়ে বসে। সেই সঙ্গে একটার পর একটা অঘটন ঘটিয়ে চলে কালু। মেলা থেকে খেলার তীর ধনুক কিনে এনে থিয়েটারে থিয়েটার খেলার সময়ে

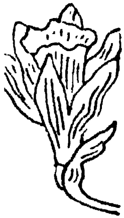
সমবয়সী এক বন্ধুর চোখে একবার সেই তীর দিয়ে আঘাত করেছিল সে। আঘাতে চোখের কোণ দিয়ে বেশ খানিকটা রক্তও পড়েছিল বন্ধুর। খবর কানে যেতে দ্বারকানাথ নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেননি। বাড়ি ফিরে এসে ছেলেকে শুধু তিরস্কারই করেননি হু'চারটে চড়ও বসিয়ে দিয়েছিলেন তার গালে।

এর পর থেকে বালক কালুর সেই থিয়েটারের আসর বসত বাড়ির পিছন দিকের আস্তাবলে। নিস্তব্ধ দুপুরে বাড়ির সবাই যখন বিশ্রাম নিতেন, মেজদা হীরেন্দ্রনাথ যখন তার ঘরে বই পড়ায় ব্যস্ত থাকতেন, বাবা যখন আপিসে, ঠিক তখন কালু সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে চলে যেত আস্তাবলে। বন্ধুরাও আসত। তারপর আস্তাবলেই শুরু হয়ে যেত কালুর থিয়েটার থিয়েটার খেলা।

আস্তাবলের গোপন থিয়েটার আসরের খবর যদিও দ্বারকানাথ তখনও পাননি তবু একদিন তিনি সস্নেহে কালুকে কাছে ডাকলেন। বললেন, আমি শুনেছি তুমি ভীষণ দুষ্টু হয়ে উঠেছ, মাকেও বিব্রত করে তুলেছ। এটা ভাল নয়। দেখেছ তো সবাই কেমন সেজেগুজে স্কুলে যায়, তোমার যেতে ইচ্ছে করে না?

কালু মাথা হেঁট করে সম্মতি জানিয়েছিল। স্কুলে যেতে হবে শুনে খুশিতে টলমল করে উঠেছিল সে। পরদিনই ছেলেকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন রক্ষাকালী। আর দ্বারকানাথ নিজেই কালুকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাড়ির কাছেই একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন রক্ষাকালী।



আস্তাবলের থিয়েটার শেষে হাজির হয়ে গেল স্কুলে।

একদিন যে মাস্টার মশাইরা অমরেন্দ্রনাথকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন, দ্বারকানাথ দত্তের ছেলে বলে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই তাঁরাই কালুর ব্যাপারে যেন একটু বেশী মাত্রায় অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম দুষ্টু ছেলেদের শাসন করতেন মাস্টার মশাইরা ঐ কালুকে দিয়েই। বলতেন, তোদের দুষ্টুমী ভাঙতে হলে ঐ কালুকে দিয়েই তোদের কান মলে দিতে হয়—

তাই করতেন। যারা দুষ্টুমী করত কালুকে ডেকে তাদের কান মলে দিতে বলতেন। কালুর মত শান্ত, এমন একটি মেধাবী ছাত্র তখন একজনও ছিল না বললেই হয়। স্কুলে গেলেই অমর শান্ত।

সাতেও থাকত না, পাঁচেও থাকত না সে ; মাস্টার মশাইরা যখন কালুকে ডেকে বলতেন, কালু, এই দুষ্টু ছেলেটার কান মলে দাও তো—, বালক অমরের মুখখানা একরাশ লজ্জায় রাঙা হয়ে যেত, নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়ে, একান্ত বাধ্য হয়ে সে মাস্টার মশাইদের নির্দেশ পালন করত। এ ব্যাপারে দুষ্টু ছেলের দল মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে যেত। মাঝে মাঝে তারা দল বেঁধে আক্রমণ করে বসত ; একলার শক্তি কতটুকুই বা ? সুতরাং অমর মাথা নত করে বন্ধুদের পাল্টা আঘাত সহ্য করত, কিন্তু কোনদিন মাস্টার মশাইদের কাছে গিয়ে নালিশ জানাতো না সে।

সেই শান্ত ছাত্র ছুটির ঘণ্টা পড়লেই হয়ে উঠত অশান্ত। একরাশ ঝর্ণা ধারার মতো যেন দুর্বার হয়ে উঠত বালক অমর। ঝড়ের বেগে বাড়ি ফিরত সে। বাড়ি ফিরে হাতের বইগুলো ফেলে দিয়ে আবার

মেতে উঠতো সেই থিয়েটার থিয়েটার খেলা নিয়ে। বাড়ি ফিরে জলখাবারটুকু মুখে তুলবার অবকাশ থাকত না তার।

মা রক্ষাকালী প্রায় প্রতিদিনই খাবারের থালা হাতে নিয়ে ছুটে বেড়াতেন ছেলের পিছনে পিছনে। কণ্ঠস্বর ভারী করে তিনি আকুতি জানিয়ে বেড়াতেন, বাবা কালু, খাবারটা খেয়ে নে বাবা—

কালু বলত, আঃ আমাকে বিরক্ত কোরো না মা, আমি খাব না—

তারপর শুরু হতো শুধু ছুটে বেড়ানো। কালু খাবে না, রক্ষাকালী তাকে খাওয়াবেন।

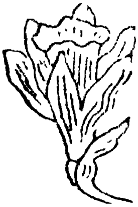
এ এক নতুন আবর্তে ঘোরা!

অনেকদিন ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যেত না, রক্ষাকালী খাবারের থালা হাতে করে ছুটে বেড়াতেন ছাদ থেকে অপরের বাড়ির অলিন্দে অলিন্দে। এই ভাবে একদিন রক্ষাকালী বাড়ির আস্তাবল থেকে আবিষ্কার করেছিলেন কালুর গোপন আড্ডাখানা। সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে কালু আস্তাবলে থিয়েটার থিয়েটার খেলা নিয়ে মেতে থাকত সেখানে। মা উত্তেজিত হলে বালক তার স্বভাব সিদ্ধ কতকগুলো ভঙ্গিমা দিয়ে মুহূর্তে মায়ের সব রাগকে জল করে দিত। জলখাবার বন্ধুদের মধ্যে বিলি করে দিয়ে কালু ওদের মন জয় করে আবার সেই খেলায় মেতে উঠত। কালুকে যেহেতু একটু বেশী মাত্রায় ভালবাসতেন রক্ষাকালী, সেই হেতু তার এই গোপন আড্ডার খবর তিনি কোনদিনই স্বামী কিংবা অন্য ছেলেদের কানে তোলেননি রক্ষাকালী।

একদিন কালু আস্তাবলের সেই থিয়েটার থিয়েটার খেলা হাজির করেছিলো স্কুলে। সেই কালুর ব্যাপারেই মাস্টার মশাইরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কালুর অপরাধ, সে ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে ক্লাসের মধ্যেই থিয়েটার থিয়েটার খেলা করে। খবরটা চাপা রইল না। দ্বারকানাথ ছেলের খবরাখবর আনতে গিয়ে সরাসরি অপমানিত হলেন স্কুল থেকে।

যে দ্বারকানাথকে দেখলে স্কুলের হেডমাস্টার থেকে শুরু করে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শ্রদ্ধায় দু'হাত জড়ো করতেন, সেই দ্বারকানাথকেই সরাসরি অপমান করতে কারও এতটুকুও দ্বিধা হলো না।

কালুর জন্য সব অপমান হজম করে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন দ্বারকানাথ।



হীরেন্দ্রনাথ তখন পড়ছিলেন।

গিরিধারী অতি সন্তর্পণে হীরেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকদিনের পুরনো চাকর গিরিধারী। সকলের কাছে গিরিধারী সহজ এবং নির্ভিক হলেও এই হীরেন্দ্রনাথের কাছে সে যেন রীতিমত জড় পদার্থ। হীরেন্দ্রনাথের কাছে শুধু গিরিধারীই নয় এ বাড়ির সকলেই যেন অনেকখানি ম্লান। গিরিধারী তাই অতি সন্তর্পণে হীরেন্দ্রনাথের কাছে এসে দাঁড়ালেই বই থেকে চোখ তুলে হীরেন্দ্রনাথ বললেন, আমাকে কিছু বলবে ?

গিরিধারী বলল, মেজদাদাবাবু, কর্তাবাবু আপনাকে একবার ডাকছেন—

হীরেন্দ্রনাথের দু'চোখে বিস্ময়। হীরেন্দ্রনাথ আপন মনেই বললেন, বাবা আমাকে ডাকছেন! ব্যাপার কি!

তারপর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে বই বন্ধ করে সোজা চলে এলেন বাবার ঘরে।

দ্বারকানাথ রাশভারী স্বরে বললেন, কালুর বিষয়ে আশা করি তুমি সব শুনেছ ?

হীরেন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ—

দ্বারকানাথ বললেন, সে যে শুধু বাড়িতে দুরন্তপনায় সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলছে তাই নয়, স্কুলে গিয়ে ক্লাশেও থিয়েটার থিয়েটার খেলা করে মাস্টার মশাইদেরও বিব্রত করে তুলেছে। এ ব্যাপারে কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর? দ্বারকানাথ আরও কিছু বলতে চাইছিলেন। পারলেন না।

হীরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বললেন, কালুকে যেমন থিয়েটারের নেশায় পেয়ে বসেছে, এবং সে যেমন করে লেখাপড়ায় অবহেলা করছে দেখতে পাই, তাতে সব ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল লাগছে না—এ ব্যাপারে আপনাকে ও মাকে একটু কঠোর হতে হবে বাবা। প্রয়োজনে আপনাকে একটা শাস্তি বিধানও করতে হবে—

দ্বারকানাথ যেন ভিতরে কেঁপে উঠলেন। দ্বারকানাথ জানতেন তিনি আর যা-ই করুন অন্তত ছোট ছেলে কালুর ওপরে নিজে থেকে কোন শাস্তি বিধান করতে পারবেন না।

হীরেন্দ্রনাথ বললেন, বাবা কিছু মনে করবেন না, কালুকে আপনি আর মা দু'জনেই আদর আর আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছেন।

এ সব কথা আজকের নয়: কয়েক যুগ আগের।

সেদিন সংসারে বোধ করি ভালমানুষের অভাব ছিল না। ভাল মানুষ অর্থে মানুষের মত মানুষ—কীর্তিমান পুরুষ। দ্বারকানাথের সংসারে হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন তেমনি এক ব্যক্তিত্ব। হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র। যেমন ছিলেন শিক্ষিত তেমনি ছিলেন দৃঢ়চেতা।

সমাজে হীরেন দত্তের মত মুখর মানুষ যেমন বিরল ছিল সেদিন, তেমনি সংসারে তাঁর মত মূক মানুষের দেখা পাওয়াই যেত না। হীরেন্দ্রনাথ নিজে অন্যায় জানতেন না তাই কারও অন্যায় দেখলে মুখ বুজে সহ্যও করতেন না। হীরেন্দ্রনাথ পরাধীনতাকে যেমন ঘৃণা করতেন, তেমনি কারও কোন স্বাধীনতায় কখনো বাদ সাধতেন না। তাই দত্ত বংশে হীরেন্দ্রনাথের ছিল প্রাধান্য। মা, বাবা এমন কি

সংসারের অন্যরা তাই বোধ করি কোন ব্যাপারে হীরেন্দ্রনাথের পরামর্শ ব্যতিরেকে এক পা-ও চলতেন না।

সেই হীরেন্দ্রনাথের শেষ বক্তব্য শুনে দ্বারকানাথ চুপ করে গেলেন। কথাটা শেষ করে চলে গেলেন হীরেন্দ্রনাথ। দ্বারকানাথের মনে একটা আশংকা থেকে গেল। রক্ষাকালীও আজ একটু বেশী মাত্রায় চিন্তিত।

দ্বারকানাথকে ঘিরেই যত ভাবনা রক্ষাকালীর। তেমনি এক দুর্ভাবনায় সারা ঘরময় পায়চারী করতে করতে এক সময়ে মেজ ছেলে হীরেন্দ্রনাথের কাছে এসে দাঁড়ালেন রক্ষাকালী। হীরেন্দ্রনাথ বললেন, আমাকে কিছু বলবে মা ?

রক্ষাকালী বললেন, তোমার জ্যাঠামশাইকে আজ বড় উত্তেজিত দেখলাম। কালুকে মেরেও তাঁর সাধ মেটেনি, আমাকে ডেকে যার পর নেই অপমান করলেন। কথা বলতে বলতে রক্ষাকালীর স্বর যেন ভারী হয়ে গেল। তিনি আরও বললেন, তোমার বাবা সব ব্যাপারেই বড় বেশী উদাসীন। বাইরে কাল-বৈশাখীর ঝড়-জল, আজ তোমার বাবার আসতে দেরী হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। আজ সারাদিন ধরে আমার ডান-চোখটা নাচছে, দুটো কাক ঝটপট করে আমার গায়ে এসে পড়ল। চারিদিকে একটা অশুভ লক্ষণ, আমার মনটা যে ভাল লাগছে না বাবা—

সান্ত্বনার স্বরে হীরেন্দ্রনাথ বললেন, সংস্কারমুক্ত হবার চেষ্টা কর মা। এ সব ভেবে নিজের মনকে কষ্ট দেবে কেন মা ? বৃষ্টিতে বাবা নিশ্চয়ই কোথাও আটকে গেছেন। কথা বলতে বলতে হীরেন্দ্রনাথের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার হীরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি বুঝতে পারি মা, জ্যাঠামশাইয়ের উদ্দেশ্য—বাবাকে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। স্বার্থ যেখানে প্রকট, সংঘাত সেখানে অনিবার্য, বাবা সেই সংঘাত চাইতে পারেন না। ভাই হয়ে দাদার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার শিক্ষা তো

বাবার নেই, তাই জ্যাঠামশাইয়ের সব অপমানকে তুমিও সহ্য কর মা—

হীরেন্দ্রনাথের কথা শেষ হতে না হতেই বৃষ্টিতে ভিজে রীতিমত স্নান করে বাড়ি ফিরলেন দ্বারকানাথ। অত্যন্ত বিমর্ষ, কোথায় যেন একটা অঘটন কিছু ঘটেছে।

নিজেকে সহজ করে নিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দ্বারকানাথ বললেন, ভাবছি হাতিবাগানের জমিটা কিনে নেওয়াই ভাল, দিন দিন এ বাড়ির আবহাওয়া যেমন তপ্ত হয়ে উঠছে তাতে নিজেকে আর ঠিক রাখা চলে না।

রক্ষাকালী কিছু বলতে চাইছিলেন। পারলেন না। বাধা পড়ল দ্বারকানাথের কথায়। বললেন, আমি সব শুনেছি—আমি জানি তুমি কি বলতে চাও—ধীরুর বিয়ের ব্যবস্থা সব পাকাপাকি করেছি শুনে দাদা আমাকে ডেকে স্পষ্টই বললেন, এই বাড়িতে নতুন বৌমাকে তুলবার আগে আমি যেন সব দিকটা একবার ভেবে দেখি।

কথা বলতে বলতে একটু উত্তেজিত হলেন দ্বারকানাথ। সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, দাদার এ কথার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পারলেও আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারব না। আমি উদয়চাঁদবাবুকে এক রকম পাকা কথা দিয়েছি যে তাঁর মেয়ে মুক্তমালাকে পুত্রবধূ করে এ বাড়িতেই আনব—, আমি যেমন দাদার অমানুষ মনটাকে ইচ্ছে করেই আঘাত করব না, তেমনি উদয়চাঁদবাবুকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাও প্রত্যাহার করব না—প্রয়োজনে তোমাদের হাত ধরে রাস্তায় নামতে পারি, তা বলে কথা পাল্টাতে পারি না—রক্ষাকালীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

দ্বারকানাথের বড় ছেলে ধীরেন্দ্রনাথ।

যথা সময়ে ধীরেন্দ্রনাথের বিয়ের সব ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেল। সিমলার নয়ন চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী উদয়চাঁদ বসুর মেয়ে মুক্তমালার সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের বিয়ে। পাকা দেখা পর্বও সমাপ্ত

হয়ে গেল। তারপর এক শুভদিনে শুভক্ষণে দ্বারকানাথ সেই মুক্তমালাকে পুত্রবধূ করে বরণ করে নিয়ে এলেন এই বাড়িতেই। চোরবাগানের বাড়িতে।

এ বাড়ির বৌ হয়ে এসে একরাশ খুশিতে ভরে উঠল মুক্তমালা। একরাশ খুশীতে যেন টলমল করে উঠল সে।

আনকোরা নতুন বৌ। এ বাড়ির যা দেখে তাই যেন ভাল লাগে তার। ওর চোখে এ বাড়ির সবাই যেন কত সহজ! কত আপন। কত সুন্দর।

মুক্তমালা যদিও এ বাড়ির বড় বৌ, তবুও সে নিতান্ত বালিকা। তাই সে জানে না এ বাড়ির এত হাসি খুশির আড়ালে একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় দানা বেঁধে আছে। কেউ তা জানতেও দেয়নি তাকে। একদিন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখল, মেজঠাকুরপো নিজের সব কিছুই একটা ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে আর একটা ঘরে জমা করে রাখছেন।

ঘর তো নয় পায়রার খুপরি।

ধীরেন্দ্রনাথের বিয়ের আগেই দ্বারকানাথ বিনা প্রতিবাদে স্বার্থপর দাদার সমস্ত দাবীকে মেনে নিয়ে ওপরের একটা মাত্র ঘর সম্বল করে, সেই ঘরের মধ্যে পার্টিসান দিয়ে তার এক ফালিতে মুক্তমালাকে তুলেছিলেন। বাকি অংশে থাকতেন দ্বারকানাথ, হীরেন্দ্রনাথ, রক্ষাকালী আর ছোট ছেলে কালু।

প্রথম প্রথম মুক্তমালার মনে এই ঘরের ব্যাপারে একটা কৌতূহল জেগেছিল, কিন্তু সে কৌতূহল দমন করেই কাটিয়েছিল মুক্তমালা। শেষ পর্যন্ত আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি সে। হীরেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে অত্যন্ত নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল মুক্তমালা, আপনার বইপত্তর সব কিছু এ ঘর থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন কেন? ও সব থাক না, কোন অসুবিধে হবে না—

হীরেন্দ্রনাথ সে কথার জবাব দেননি। তাই আবার একই কথার

পুনরাবৃত্তি করেছিল মুক্তমালা। হীরেন্দ্রনাথ জবাবে বলেছিলেন, একটা কথা বলি বৌঠান, কোন ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই—

এ কথায় মুক্তমালার ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল। এরপর থেকে নিজেকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রেখেই চলছিল মুক্তমালা।

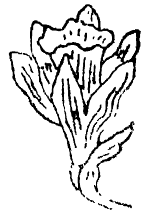
অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিন আর এক চরম সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। অতি ভোরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বিস্ময়ের আতিশয্যে চমকে উঠেছিল মুক্তমালা। ঘরের বাইরে খোলা ছাদে একটা ইজিচেয়ারে শ্বশুর মশাইকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে মুক্তমালা মুহূর্তে যেন মূক হয়ে গিয়েছিল। ছুটে এসেছিল স্বামীর কাছে। ধীরেন্দ্রনাথকে ঘুম থেকে টেনে তুলে সেই অস্বাভাবিক দৃশ্যের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ধীরেন্দ্রনাথের ভিতরকার মানুষটাও চমকে উঠেছিল। কথা বলেননি। মুক্তমালার চোখের সামনে মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ।

পরদিন মুক্তমালা স্বামীকে বলেছিল, আমি বাড়ি যাব—

ধীরেন্দ্রনাথ একটু বেশী মাত্রায় অবাক হয়েছিলেন।

এরপর সব কথাই খুলে বলেছিল মুক্তমালা। বলেছিল, বাবা সবার সুবিধের জন্য রাতে ঘরের বাইরে ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে থাকেন আর আমি এ বাড়ির বৌ হয়ে ঘরে থাকি, তা কি মানায়?

ধীরেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে সেদিন দেখেছিলেন মুক্তমালাকে। তারপর, বিনা বাক্যব্যয়ে ক'টা দিনের মধ্যেই মিথ্যে অজুহাতে স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়িতে রেখে এসেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ।



হাতিবাগানে বাড়ি তৈরি হয়ে গেল।

ভোলানাথ দত্তের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন দ্বারকানাথ। ভোলানাথ হলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বড় ছেলে, দ্বারকানাথের বড় দাদা। ভাইকে দেখে ভোলানাথ এতটুকুও বিচলিত হলেন না। রাশভারী স্বরে বললেন, আমি জানি তুমি কেন এসেছ। যাও, সুখে থাক—

দ্বারকানাথ জানতেন, দাদা বিচক্ষণ না হলেও ধুরন্ধর। তাই সেদিন আর অন্য কোন কথার অবতারণা না করে দ্বারকানাথ ফিরে এসেছিলেন।

পরদিনই চোরবাগানের স্বার্থপরতার তপ্ত আবহাওয়া থেকে চিরদিনের মত মুক্তি নিয়ে নিজের পরিশ্রমের অর্থে গড়া হাতি-বাগানের নতুন বাড়িতে উঠে গেলেন দ্বারকানাথ। সেই দিনই চোরবাগানের বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক মুছে গেল চিরদিনের মত।

হাতিবাগানের বাড়িতে উঠে আসার পর কালুর দৌরাত্মপনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য দ্বারকানাথ প্রথমেই তাকে ভর্তি করে দিলেন কটন ইনস্টিটিউশানে। বাড়ির কাছে বড় স্কুল। কড়াকড়ি অনেক।

নতুন স্কুল, নতুন বই, নতুন পোশাক আর নতুন বন্ধু পেয়ে কালু বেশ আনন্দে খুশিতে ভরে ছিল। ভালই ছিল কালু।

মহেন্দ্র, রঘুনাথ এদের সঙ্গে কালুর যত বন্ধুত্ব। মহেন্দ্রর সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝগড়া হতো না তা নয়।

মহেন্দ্র অহেতুক কালুকে রাগিয়ে দিত। কালুর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে মাঝে মাঝেই মহেন্দ্র বলত, কালু তোমারে ভালবাসি তাই তোমারে দেখতে আসি—, কথাটা মহেন্দ্রর নিজস্ব কথা নয়। হয়তো

কখনো কাউকে সুর করে কথাটা বলতে শুনেছিল, ভাল লেগেছিল, আর সেই কথাটাকেই তেমনি সুর করে ঢেলে দিত কালুর কানে। অল্প বয়সে মহেন্দ্র একটু বেশী পাকা ছিল। সে কথাটা শুধু সুর করে বলেই ক্ষান্ত হতো না, কথাটা শেষ করেই কালুর মুখখানা টিপে দিত।

একদিন সহসা উত্তেজিত হয়ে গেল কালু। রঘুনাথ শেখাল পাল্টা জবাব দিতে। আর সেই থেকে আর এক বিপত্তির সৃষ্টি।

মাস্টার মশাইদের চোখে অপরাধী হ'ল কালু। কালুর সেই অপরাধের মাত্রা আরও গভীর হয়ে গেল সেইদিন, যেদিন ক্লাশের মধ্যেই কালুকে অভিনয় করতে দেখা গেল। কালুর এই থিয়েটারের ব্যাপারে কটন স্কুলের মাস্টার মশাইরা দ্বারকানাথের কাছে অভিযোগ করলেন।

নির্ঝঞ্ঝাটে দ্বারকানাথ কটন স্কুল থেকে ছেলেকে সরিয়ে এনে আবার ভর্তি করে দিলেন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশানে। তারপর একটার পর একটা স্কুল পাল্টানোই হল কিন্তু কালুকে অর্থাৎ অমরেন্দ্র-নাথকে কোন মতেই শুধরানো গেল না।

সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে কালু সরাসরি মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রক্ষাকালী ছেলেকে আজ বেশ খুশি খুশি দেখে বললেন, কিছু বলবি বাবা? কালু বলল, আমাদের স্কুলে স্পোর্টস হবে, আমি দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছি মা—

কথা শুনে রক্ষাকালী শুধু খুশি হলেন না, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কালুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন, লক্ষ্মী ছেলে আমার। এই তো কত ভাল হয়েছ তুমি। তুমি খেলায় নাম দিয়েছ শুনলে তোমার বাবাও কত খুশি হবেন—

এরপর অমর বলেছিল, কাল আমাকে গিরিধারীদাদা মাঠে পৌঁছে দিয়ে যেন চলে আসে, ও থাকলে আমি দৌড়তে পারব না। খেলা শেষ হয়ে গেলে আবার গিয়ে আমাকে যেন নিয়ে আসে—

মায়ের মন, তাই আদরের ছেলের কোন কথাতেই সন্দেহ

জাগেনি রক্ষাকালীর। কালুর সেই আব্দারও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু অমর সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি। স্কুলে স্পোর্টস হয়েছিল ঠিকই কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম দেয়নি অমর। সেদিন মায়ের কাছে মিথ্যে বলার পিছনেও একটা কারণ ছিল। সে কারণ আর কিছু নয়, থিয়েটার।

কথা রেখেছিল গিরিধারী। অমরকে মাঠে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছিল সে। গিরিধারী মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলে অমর এগিয়ে গেল উৎসুক দর্শকদের দিকে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। হাজার হাজার দর্শক বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে। একটা উত্তেজনায় ওরা সবাই যেন উদ্বেলিত। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সবাই মুখর। অমর শুধু একরাশ ভাবনা নিয়ে সেই ভিড়ের ভিতর থেকে কাকে যেন খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। কিছু একটা হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন করে খোঁজে অমরের ছ'চোখে তেমনি একটা চঞ্চলতা। কোন খেলাই তার ভাল লাগছে না।

হঠাৎ চমকে উঠল অমর। যাকে এতক্ষণ খুঁজছিল সে আসছে। এই বন্ধুটির হাতেই টাকা গুঁজে দিয়ে কানে কানে কি যেন বলছিল অমর ছ'দিন আগে, ক্লাশে। তাকে দেখে আনন্দে নেচে উঠল সে। বলল, এনেছিস ?

বন্ধুটি জবাব দিল, এনেছি, একটু আড়ালে চল—

কালু সবার চোখ এড়িয়ে সেই বন্ধুর সঙ্গে সরে এল আড়ালে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে স্কুলের পড়ার বইয়ের ভিতর থেকে একটা বই বার করে অমরের হাতে তুলে দিল সে। একেবারে নতুন বই। বন্ধুটি বলল, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকান থেকে কিনে নিয়ে এলাম।

অমর বইটির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। নাটকের বই—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। তারপর এক সময় সেই নাটকের পাতায় চোখ রাখল সে। পড়তে পড়তে সে গভীরে চলে গেল। দূরে স্কুলের ছেলেরা যখন

আনন্দমুখর তখন বালক অমর সেই নির্জনে বসে নাটক পড়ার মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। এ এক বিচিত্র নেশা। আর সেই নেশায় একটা বালকের সারা দেহ মন যেন অস্বাভাবিক ভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কোচোয়ান গাড়ি থামাও—

থেমে গেল জুড়ি গাড়ি। গাড়ির ভিতরে বসে অমর দেখল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকান। কোচোয়ান অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, এখানে কেন ছোটবাবু?

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে কালু বলল, একটু দাঁড়াও, একখানা পড়ার বই কিনতে হবে—তারপর সরাসরি দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে, বই আছে?

দোকানির চোখে মুখে বিস্ময়! বললে, বইয়ের দোকানে তো বই-ই থাকে, কি বই চাই তোমার?

অমর বলল, নাটকের বই—

দোকানির পাল্টা প্রশ্ন, বইয়ের নামটা বল--

অমর এবার চিন্তিত। কি যেন নামটা! তারপর মনে পড়ল। বলল, নসীরাম—

দোকানি বলল, এ নাটক দিয়ে কি করবে তুমি?

উত্তর যেন জিভের ডগায় এগিয়ে ছিল। বলল, পড়ব। কত দাম বলুন—

দোকানি দাম বলতে অমরের মুখখানা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল। দু'টাকা!

অমর আশাহত হয়ে সেদিন ফিরে এল বটে কিন্তু টাকার অভাবে নসীরাম কিনতে না পারার জন্য ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ল সে। কেমন যেন অন্যমনস্ক।

রক্ষাকালী ছেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বাবা ?

অমর জবাব দিল. কিছু না—

এরপর রক্ষাকালী আর কথা না বাড়িয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একরাশ অস্বস্তি নিয়ে অমর এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ঘুমুতে পারে না। নিজেকে যতবার সহজ করে তোলবার চেষ্টা করে ততবারই সেই দুটো টাকা যেন বার বার উত্যক্ত করে তোলে তাকে। যেমন করেই হোক টাকা চাই।

রাত গভীর হল। সবাই ঘুমুচ্ছে, শুধু অমরের চোখে ঘুম নেই। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে, পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে মায়ের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। আস্তে করে বিছানার নীচে হাত গলিয়ে দিয়ে আবার হাতটা টেনে নিয়ে ফিরে এল নিজের বিছানায়। কিছু একটা আবিষ্কার করার আনন্দে ভরপুর অমর। চোখে ঘুম নেই। রাত এক সময় সকাল হয়ে গেল।

একটা একটা সিঁড়ি বেয়ে গিরিধারী যখন নীচের শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল তখন ভিতরকার কান্নাটা যেন বেরিয়ে এল তার। আজ গিরিধারীকে এ বাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হচ্ছে। এক গুরুতর অপরাধের জন্য রক্ষাকালী স্বয়ং গিরিধারীকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও গিরিধারী জানে না তার অপরাধটা কি তবুও তার শাস্তি হয়ে গেল। আজ এই মুহূর্তেই গিরিধারীকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে, রক্ষাকালীর তেমনিই নির্দেশ।

অনেকদিনের পুরনো চাকর গিরিধারী।

এ বাড়ির বড় ছেলে ধীরেন্দ্রনাথের জন্মের অনেক আগেই একদিন ভাগ্যের লিখনে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ভাসতে ভাসতে এই বাড়িতে এসে উঠেছিল গিরিধারী। গিরিধারীর তখন কত বয়েস ছিল তার হিসেব আজ নেই, তবুও গিরিধারীর এটা স্পষ্ট মনে আছে তারই চোখের সামনে ধীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ এক এক করে সবাই এসেছে। গিরিধারী তাদের নিয়ে খেলা করেছে, বায়না ধরলে গান গেয়ে ভুলিয়েছে, হাত ধরে বেড়িয়েছে কতদিন। এমনি করে গিরিধারী এক সময় অনেক বয়সের সোপানে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই গিরিধারী শেষ বারের মত একবার গোটা বাড়িটা ভাল করে দেখল। তারপর কাপড়ের পুঁটলিটা বগলে চেপে ধরে যখন পা বাড়াল ঠিক সেই সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল অমর। বলল, এ কি, তুমি কোথায় যাচ্ছ গিরিধারী দাদা?

গিরিধারী জবাব দিতে পারল না! ওর মুখে ভাষা ফোটার আগেই দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

বালক অমর জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছ?

গিরিধারী বললে, জানিনে। তোমাদের ছেড়ে কোথায় যাব তাই ভাবছি ছোট দাদাবাবু।

কোন কিছুকেই সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র অমর নয়। এক্ষেত্রেও গিরিধারীকে ছাড়তে পারল না সে। বললে, তুমি চলে গেলে আমাকে স্কুলে দিয়ে আসবে কে? আমাকে গান শোনাবে কে? কেন চলে যাচ্ছ গিরিধারী দাদা?

গিরিধারী বলল, কর্তা মা বলেছেন আমি চোর—

কথাটা শেষ করার আগেই নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলল গিরিধারী। কাঁদতে কাঁদতে বলল, কর্তামার বিছানার তলা থেকে দু'টাকা চুরি গেছে, কত করে বললুম যে টাকা আমি চুরি করিনি। বড় দাদাবাবু আমার ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে বললেন—যা বেরিয়ে যা আমাদের বাড়ি থেকে, আমি যাই ছোট দাদাবাবু।

কথা শেষ করে গিরিধারী চলে যেতে উদ্যত হলে বাধা দিল অমর। এক রকম জোর করে গিরিধারীকে টানতে টানতে মায়ের সামনে এনে হাজির করল।

অমর বলল, মা, গিরিধারী দাদা টাকা চুরি করেনি মা, আমি চুরি করেছি—তুমি আমাকে শাস্তি দাও—গিরিধারী দাদাকে যেতে বারণ কর মা—

এরপর সব কথাই খুলে বলল অমর। রাতে সে কেমন করে বিছানার তলা থেকে টাকা চুরি করেছিল, টাকা দিয়ে সে কি করেছে সব কথাই নির্ভয়ে ব্যক্ত করল সে। বালক অমরেন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তির জন্য রক্ষাকালী যেন মুহূর্তে মূক হয়ে গেলেন। ওদিকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল গিরিধারী! মা রক্ষাকালী যতখানি জ্বলে উঠেছিলেন ঠিক ততখানি নরম হয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

কিন্তু কালুর সব অপরাধ এখানেই খণ্ডন হয়ে গেল না। হীরেন্দ্রনাথ যখন শুনলেন কালু টাকা চুরি করে নাটক কিনেছে তখন নিজেকে আর সংযত করতে পারেননি। উত্তেজিত হয়ে সোজা কালুর পড়ার ঘরে এসে সব বই টেনে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন তিনি। পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেই নসীরামও।

হীরেন্দ্রনাথের আগুনে একখানা বই পুড়ে ছাই হযে গেল বটে, কিন্তু নাটকের প্রতি ভালবাসা অমরের মনের গভীরে পুড়ে যেন আরও খাঁটি হয়ে গেল।

অতি সন্তর্পণে ধীরেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন।

বড় দাদাকে দেখে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন হীরেন্দ্রনাথ। চাপা স্বরে বললেন, বস দাদা—। ধীরেন্দ্রনাথ ততক্ষণ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেন একটা ভাবনার গভীরে চলে গিয়েছিলেন। মেজ ভাইয়ের কথায় তাঁর সম্বিত ফিরল। বললেন, হ্যাঁ বসছি। হীরু, তোমার পরীক্ষা শুনলাম—

হীরেন্দ্র বললেন, হ্যাঁ—

ধীরেন্দ্রনাথ তেমনি চাপা স্বরেই বললেন, এ তো আর ছোটখাট পরীক্ষা নয় একেবারে এম. এ. পরীক্ষা, তাই বলছিলাম, মা, তোমার বড় বৌঠান এঁদের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে তুমি পড়াশুনা করগে, তা ছাড়া আমিও তো আছি—. জানি বাবাকে এই অবস্থায় রেখে লেখাপড়ায় মন বসে না, তবুও আমি বলছি ভাই তুমি তোমার ঘরে যাও--

হীরেন্দ্রনাথ বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে বড়দা—।

ধীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু আজ কেমন বলে গেলেন ?

হীরেন্দ্রনাথ বললেন, যন্ত্রণাটা আজ কমের দিকে তবে অন্য উপসর্গ আগের মতই আছে---

দ্বারকানাথ এবার ক্ষীণ স্বরে বললেন, ধীরু এসেছ ?

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ বাবা, আপনি উতলা হবেন না। আমি আপনার কাছেই আছি—

দ্বারকানাথ আবার ক্ষীণ স্বরে বললেন, ধীরু, আজ তুমি র‍্যালি

কোম্পানির বাড়িতে গিয়েছিলে? যা বলেছিলাম সেই মত সব পাকা করে এসেছ তো?

ধীরেন্দ্রনাথের মুখখানা সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, আপনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন বলে ওখানকার সবাই বেশ দুঃখিত। আপনার অবর্তমানে আমি কাজ করব শুনে ওরা আমাকে স্বাগত জানালেন—

এবার যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দ্বারকানাথ।

ঘরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন দ্বারকানাথ আর আস্তাবলে থিয়েটারের আসর বসেছে অমরেন্দ্রনাথের। বাবার অসুস্থতার ব্যাপারে অমরেন্দ্রর যেন কোন ভাবনা নেই। অমরেন্দ্রকে ঘিরে স্তাবকের দল। অমর সুর করে নাটক পড়ছিল। নিতান্ত নির্জলা নাটক পড়া নয়। নির্ভেজাল আড্ডা নয়। রীতিমত প্রাপ্তবয়স্কদের মত আসর। আড্ডা যখন জমে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় টোকা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আস্তাবলের আসরের চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সকলের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ।

চাপা স্বরে অমর বলল, মনে হয় মেজদা—

সকলেই নিতান্ত ভাল মানুষের মত নিজেদের সহজ করার চেষ্টা করল। আসরে নিছক নাটক পড়াই চলছিল না, সেই সঙ্গে নেশার ফোয়ারা ছুটছিল। দরজায় টোকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ছেলেটি গড়গড়ায় তামাক টানছিল সে চোখের পলকে লুকিয়ে ফেলল গড়গড়া। অমরের হাতে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট, শব্দ শুনে সিগারেট নিভিয়ে দিয়ে চোখের ইশারায় দরজা খুলে দেবার নির্দেশ দিল সে।

একটা রহস্যঘন মুহূর্ত। নিতান্ত চোরের মত অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েই আড়ালে গা ঢাকা দিল একটি ছেলে। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল ওদেরই এক বন্ধু। ওকে দেখে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল সবার।

ঘরে ঢুকেই দ্রুত ছেলেটি নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে জামার তলা থেকে আস্তে আস্তে টেনে বার করল একটা বোতল।

একরাশ কৌতূহলে সকলের দৃষ্টি চক চক করে উঠল। মদের বোতল। বোতল দেখে একমাত্র অমর ছাড়া বাকি সকলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠেই আবার থেমে গেল।

উত্তেজিত অমর বলল, তোরা যদি এমন করে চিৎকার করিস তাহলে কাল থেকে এখানে আর নাটক করা যাবে না—

নিজেদের সামলে নিল ওরা।

অমর বলল, তোমরা মদ খাবে?

বন্ধুদের মধ্যে একজন বলল, কোথায় পেলি রে?

বোতলটি মেঝের ওপরে রাখতে রাখতে ছেলেটি বলল, আমার বাবা রোজ খায়, আমি চুরি করে বোতলটা নিয়ে এলাম। বাবা রোজ মাকে বলে, মদ না খেলে থিয়েটার জমে না—।

থিয়েটারের সঙ্গে মদের একটা সম্পক আছে. সে কেমন সম্পর্ক, কে কে মদ খেয়ে অভিনয় করে থিয়েটারে—তারও একটা তালিকা পেশ করল ছেলেটি। অভিনেতার ছেলে বলে ও সব জানে।

অমর প্রথমে মদ খেতে রাজী হয়নি। কিন্তু মদ খাবার জন্য রীতিমত জোর করেছিল বন্ধুরা, পরে বুঝিয়েছিল মদ খেলে থিয়েটার জমে। কাঁদতে চাইলে কাঁদা যায়, হাসতে চাইলে হাসা যায়।

অমরের মনের ভিতরে একটা আলোড়ন উঠেছিল। খাবে কি খাবে না এমন একটা সংকটের দোলা। তারপরেই বালক অমরেন্দ্র-নাথের এই সঙ্গই টেনে নিয়ে গেল তাকে আর এক অপরাধের বিবরে।

চিঠিটা পড়ে ভিতরে ভিতরে তপ্ত হলেন হীরেন্দ্রনাথ।

অপেক্ষা না করে পোশাক পাল্টে নিয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক তখনই ইন্দুমতী এসে পাশে দাঁড়াল। হীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী বললেন, তোমার আজ কি হয়েছে, শরীরটা ভাল আছে তো ?

হীরেন্দ্র বললেন, ইন্দু, কালু স্কুলে গেছে ?

ইন্দুমতী বলল, বাড়ি থেকে তো গেছে তারপর আর জানিনে—

কথাটা এক রকম ছুঁড়ে দিয়েই ইন্দুমতী চলে গেল।

হীরেন্দ্রনাথ সোজা চলে এলেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে। গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন, ব্যাপার কী ? হঠাৎ তলব কেন ?

হেডমাস্টার বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, ছাত্রদের প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয় বলেই আপনাকে চিঠি দিয়ে বিরক্ত করেছি—

হীরেন্দ্রনাথ বললেন, কেন, কালু কি কোন—

কথা শেষ হয় না। হেডমাস্টার মশাই বললেন, শুনলে আঘাত পাবেন, অমরেন্দ্রনাথ ইদানীং স্কুল বর্জন করেছে, ছাত্র হিসেবে ছেলেটা নেহাৎ মন্দ ছিল না, তবে এখন আমাদের মনে হয় কুসংসর্গে পড়েছে, এখন সে আউট অব কন্ট্রোল—

হীরেন্দ্রনাথের চোখে মুখে ভাবান্তর। বললেন, এখন তাহলে কি করতে বলেন ?

হেডমাস্টার স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, আমরা ওর নাম কেটে দিয়েছি—আপনি ওকে অন্য কোথাও ভর্তি করতে পারেন—

অপমানে হীরেন্দ্রনাথের ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল। এরপর আর কথা না বাড়িয়ে তিনি সোজা চলে এলেন বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে যখন তিনি ভিতরে আসছিলেন তখন তাঁর দেহের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছিল। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে ফুটে উঠছিল তপ্ত মানসিকতা। আস্তাবলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন হীরেন্দ্রনাথ।

ক্ল্যারিওনেটের বেসুরো আওয়াজে চমকে উঠলেন তিনি। সহসা যেন মূক হয়ে গেলেন। কোথা থেকে ভেসে আসছে এই বিকৃত শব্দ! কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলেন হীরেন্দ্রনাথ।

এতক্ষণে আস্তাবলের ভিতর থেকে ভেসে আসা শব্দ আবিষ্কার করলেন তিনি। দরজায় চাপ দিলেন। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। সন্দেহ ঘনীভূত হলে দরজার ছিদ্র দিয়ে দৃষ্টি ফেললেন হীরেন্দ্রনাথ। একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

অমর থিয়েটার করছে! উত্তেজনায় ফেটে পড়ে দরজার ওপরে জোর করে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। সামনে ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখার মত শিউরে উঠলেন হীরেন্দ্রনাথ। অমরেন্দ্রনাথের বন্ধুরা ভয়ে যে যেদিকে পারল ছিটকে গেল. হীরেন্দ্রনাথ দেখলেন কালু বোতল থেকে কি যেন ঢালছে মুখে। সামনে মেজদাকে দেখেই অমরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল বোতলটা।

হীরেন্দ্রনাথ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রুমাল দিয়ে নাক চাপা দিলেন। মদের গন্ধ গোটা আস্তাবল ভরে গিয়েছিল।

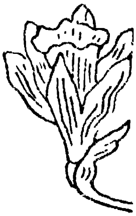
হীরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন অমর মদ খেয়েছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হীরেন্দ্রনাথ যেন নিজের অস্তিত্বকে ভুলে গেলেন।

মুহূর্তে হিংস্র বাঘের মত ছোট ভাইয়ের ঘাড়টা চেপে ধরলেন

তিনি। তারপর তাকে লোহার রেলিংয়ের সঙ্গে বেঁধে শক্ত কাঠের রুল দিয়ে এমন মারলেন যার ফলে গোটা দেহটা অমরের ফুলে উঠল।

অসহ্য যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বালক অমরেন্দ্রনাথ।

ঘরে এসে নিজেকেও সামলে রাখতে পারেননি হীরেন্দ্রনাথ। উত্তেজনার মাথায় ছোট ভাইকে মেরে অনুশোচনায় ছটফট করতে করতে নিজেও ভিতরে ভিতরে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি।



এমনি করেই শত শাসন সত্ত্বেও কালু অধঃপতনের শেষ সোপানে এসে দাঁড়াল।

বিকেল তখন চারটে। সমস্ত আকাশ জুড়ে গভীর কালো মেঘ জমা হয়ে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নেমে এল ভয়ঙ্কর প্রলয়। বিদ্যুৎ চমকাল। ঝড় আর বৃষ্টির দাপটে গোটা কলকাতার জীবনযাত্রা যখন প্রায় স্তব্ধ ঠিক সেই সময়ে দত্তবাড়ির অলিন্দে নেমে এল এক মহা সর্বনাশ। মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়েও দ্বারকানাথ যেন কিছুতেই চলে যেতে পারছিলেন না। চিরদিনের মত হারিয়ে যাবার আগেও শেষ বারের মত যেন চোখের মণি কালুকে কাছে পাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

খবর পেয়ে ছুটে এল কালু। মৃত্যু পথযাত্রী বাবার ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

সেই মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল। দ্বারকানাথ মারা গেলেন।

বাবাকে হারিয়ে অমরের মনটা ভেঙে তালগোল পাকিয়ে গেল।

সব দুরন্তপনা, সব উচ্ছ্বাস, সব অন্যায় থেকে কখন যে অমর সরে এল তা বোধ করি সে নিজেও জানে না। সাধের নাটক তাতেও আর মন বসাতে পারে না সে। সব সময় দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে অমরেন্দ্রনাথ। সারাদিনের মধ্যে কারও সঙ্গে একটা কথাও বলে না সে। একলা ঘরে চুপ করে যখন বসে থাকে তখন হয়তো বাবাকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়। যখন ভাবে তার বাবাকে পৃথিবীর আর কোন ঠিকানায় খুঁজে পাওয়া যাবে না তখন ওর দু চোখ দিয়ে আপনা থেকেই জল গড়িয়ে পড়ে।

বড়বৌদি মুক্তমালা যখন কাছে এসে দাঁড়ান, সস্নেহে মাথায় হাত রাখেন তখন অমর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মা যখন পাশে এসে দাঁড়ান তখন অমর যেন একরাশ প্রশ্ন নিয়ে শুধু চেয়ে থাকে। হীরেন্দ্রনাথ ডাকলে সাড়া দেয় না। ধীরেন্দ্রনাথ বন্ধ দরজায় টোকা মারলে দরজা খুলে বাইরে আসে না।

বাবা মারা যাওয়ার আগে কেউ তার খোঁজ করেনি কেন! বাবা কেন চলে যাবার আগে একবার তার সঙ্গে কথা বলে যাননি! সকলের ওপর অভিমান তাই এত বেশী অমরের।

অমরের অভিমান শুধু বাবার ওপরে নয়, বাড়ির সকলের ওপর। আর সেই অভিমানেই কাল্‌নু নিজেই নিজেকে পাল্টে নিল মুহূর্তে। স্কুল বর্জন করে বইপত্তরের সঙ্গে সব সম্পর্কই তুলে দিল সে। সময় মত স্নান খাওয়া বন্ধ করে দিল।

ছেলের এই আকস্মিক পরিবর্তনে রক্ষাকালীর ভিতরকার মানুষটা যেন এবার দুশ্চিন্তার আবর্তে শুধু ঘুরে চলে।

একেবারে চোখের সামনে অমরকে দেখে গিরিশবাবু বললেন, কেমন আছ ?

বিস্ময়ের ঘোর তখনও অমরের কাটেনি। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষকে নিজেদের বাড়িতে দেখতে পাবে তা বিশ্বাসই করতে পারেনি।

গিরিশবাবু আবার বললেন, শুনেছি তুমি নাকি সর্বক্ষণ থিয়েটার থিয়েটার কর। তা ভাল, তবু বলি, আগে লেখাপড়া শিখে বড়দা মেজদার মত হও তারপর ওসব নিয়ে মেতে থেকো, আর তা না করলে জীবনে পস্তাবে—

অমর সুবোধ বালকের মত সেই উপদেশ মেনে নিয়েছিল। গিরিশবাবু চলে যাবার পরই অমর ছুটতে ছুটতে মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিল, মা, গিরিশ ঘোষ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন কেন ?

অনেকদিন অমরের মুখে থিয়েটারের কথা ছিল না। আজ গিরিশবাবু প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতেই রক্ষাকালী ভিতরে ভিতরে খানিকটা কেঁপে উঠলেন। ছেলের মধ্যে তিনি যেন আবার সেই আগের ছবি দেখতে পেলেন। তাই প্রথমে সঠিক উত্তর দিতে চাননি রক্ষাকালী। শেষ পর্যন্ত অমরের আব্দারকে উপেক্ষা করতে না পেরে বলেছিলেন, উনি আমাদের আত্মীয় হন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে শুনে আনন্দে অমরের চোখজোড়া চকচক করে উঠেছিল। কিছু একটা আবিষ্কার করতে পারলে মনের যে অবস্থা হয় তেমনি একরাশ জয়ের আনন্দে অমর মুহূর্তে এমন পাল্টে গেল, যে দেখে মনে হল না এই ছেলেই বাবাকে হারিয়ে একদিন আগে পর্যন্ত হাসতে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল, এ

সেই। আনন্দে দিশেহারা অমর সবার সব ডাক উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আবার অমরের জীবন চলল সেই আগের মত। আবার সেই নাটক, সেই দৌরাত্ম্যপনা, সেই অবাধ্যতার জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া।

এ সংসারে ভাল মানুষের যেমন অভাব নেই তেমনি মন্দ মানুষের সংখ্যাও কম নয়। বরং সংখ্যায় তারাই বেশী। সমাজে এরাই পচন ধরায়। অমরের বাল্যসঙ্গীরা ছিল ঠিক তেমনি। অমর শেষ পর্যন্ত তাদের হাত ধরে এক পঙ্কিল পথে নেমে এল।

ইদানীং কাঁচা টাকার ওপরে একটা বিরাট লোভ জন্মেছে অমরের। শুধু মাকেই নয়, বড দাদাকেও এই টাকার ব্যাপারে রীতিমত বিব্রত করে তুলছে সে। সময় নেই অসময় নেই টাকার প্রয়োজন হয় তার। অত্যন্ত জেদ অমরের। একবার যা চাইবে তৎক্ষণাৎ তা না পেলে গোটা বাড়িতে একটা সীমাহীন যন্ত্রণার সৃষ্টি করে ছাডবে। সকলের মনে একই প্রশ্ন বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। এত টাকা দিয়ে কি করে অমর ? কাকে দেয় ?

প্রথম প্রথম কানাঘুষো শোনা যেত নট-নটীদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে অমর টাকাটা থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষের হাতে তুলে দেয়।

অনেকে খবর আনে, অমর টাকা নিয়ে নেশা করে অনেকে বলেছিল, এখন বাঈজীপাডার বাঈজীদের পাল্লায় পড়েছে অমর।

এক মুখ থেকে আর এক মুখ এমনি করে পাঁচ কানে যেমন রটেছিল তেমনি করেই বোধকরি একদিন রক্ষাকালীর কানেও এসেছিল ছেলের নানা কুকীর্তি কাহিনী। যা সত্য নয় তাই নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে ভেসে এসেছিল মায়ের কানে।

অমর সংসারে অন্যদের তুলনায় মাকেই ভালবাসত বেশী। সেই মায়ের চোখে জল দেখে একদিন অমরের ভিতরকার মানুষটাও

কেঁদে উঠল। মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাঁদছ কেন মা?

রক্ষাকালী সে কথার কোন জবাব দিতে পারেননি।

নিতান্ত অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে অমর বলেছিল, আমার সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা শুনেছ, তাই না মা? মা তুমি বিশ্বাস কর, তুমি যা শুনেছ তা সত্যি নয়, যারা আমার সম্বন্ধে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছে তারা কোন না কোন স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্যই বলেছে মা—

রক্ষাকালী আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। উত্তেজনায় ফেটে পড়ে তাঁর আদরের কালুর গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন।

অমর কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, তোমরা কেউ আমাকে ভালবাস না। আমি কি চাই, কি পেলে আমার মন শান্ত হয় তা তোমরা কেউ শুনতে চাও না। দাদা সব সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন, ক'টা টাকা চাইতে হলে দাদার কাছে হাত পাততে হয়। টাকা চাইলে দাদাও বকাবকি করেন। তুমি দাদাকে বলে দিও মা আর কোন দিন আমি দাদার কাছে হাত পাততে যাবো না। আর তুমিও ভাল করে জেনে নাও মা, যদি মরেও যাই তবুও থিয়েটার থেকে সরে আসব না আমি—

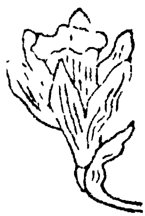
রক্ষাকালী বলেছিলেন. ছি ছি ছি, তোমার এতদূর অধঃপতন! অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে তুমি খুব বড় হয়ে গেছ ভেবেছ, তাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছোট মুখে বড় বড় কথা! কোন ভদ্র সন্তান থিয়েটার করে না—

অমর পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, তাহলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর —এঁরা কি ভদ্র সন্তান নন মা?

রক্ষাকালী ছেলের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একটা তেরো চোদ্দ বছরের ছেলের মুখে এ সব কথা যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

হঠাৎ কি খেয়াল হল ছেলের, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, কেঁদ না, আমি কোনদিন তোমার অবাধ্য হব না মা। বড়দাকে বল আমাকে একটা কাজ খুঁজে দিতে। আমি কাজ করব মা—

ছেলের সহসা এই পরিবর্তনে রক্ষাকালী ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন।



মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে ছোট ভাইয়ের জন্য একটা চাকরির জন্যে র‍্যালি কোম্পানির সঙ্গে কথা বললেন ধীরেন্দ্রনাথ। কালু এই চাকরির মধ্যে এসে নিজেকে বুঝতে শিখবে, নিজেকে শুধরে নিতে পারবে আর তখন সে টাকার জন্য বিরক্ত করবে না কাউকে— এ সব ভেবেই ধীরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত র‍্যালি ব্রাদার্সেই একটা চাকরি পাকা করে এলেন কালুর জন্য।

চাকরি ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে।

চাকরি জীবন মানেই সাবালকত্ব লাভ করা—এমন একটা ধারণার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল অমরের মনের ভিতরে সেই প্রথম দিনেই। সে যেন হঠাৎ বয়সে অনেক বড় হয়ে গেল।

সংসারের কেউ তাকে রাঙা চোখের গণ্ডীতে আটকে রাখতে পারবে না এমন একটা মন নিয়েই অমর নিজের তৈরী পথ ধরেই চলতে থাকল।

অফিস থেকে বাড়ি এসে বুড়ি ছোঁয়া গোছের একটু জলখাবার

মুখে দিয়েই সোজা চলে যেত আড্ডাখানায়। তারপর সেই গভীর রাতে বাড়ী ফেরা।

একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে গেল। তেরো বছরের অমর এখন উনিশ বছরের যুবক। আড্ডাখানায় অমর আর র‍্যালি কোম্পানির ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের অমরেন্দ্রনাথ, হয়ে গেল সম্পূর্ণ আলাদা দুটো মানুষ।

বাইরে যতক্ষণ-ততক্ষণই অমর সজীব। কিন্তু অফিসের চেয়ারে গিয়ে বসলেই এক রাশ চাপা যন্ত্রণায় যেন ছটফট করে সে। কাজে মন বসাতে পারে না। কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়ে বারে বারে।

ঠিক তেমনি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেদিন অফিসের চেয়ারে বসে ছিল অমর। অঘোরবাবু পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আস্তে করে কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললেন, কানু, তোমাকে একটা কথা বলব?

অমর এতক্ষণে যেন নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এল। চোখ তুলে তাকাল, কি বলবেন বলুন—

অঘোরবাবু আমতা আমতা করে বললেন, কথাটা বড়বাবুর কানে গেলে ভাল হত না। তাই ব্যাপারটা যখন ধরেছি তখন তোমাকে একবার দেখানো দরকার।

অমরের চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। একটু উত্তেজনার সঙ্গেই বলল, দেখুন অঘোরবাবু, এ ধরনের কথা আমার ভাল লাগে না। আসল কথাটা বলুন তো—

এবার অঘোরনাথ পাঠক একখানা মোটা হিসেবের খাতা অমরের চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন, মাথার মধ্যে দুটো চিন্তা থাকলে কোন চিন্তাই কাজে লাগে না। পাকা কেরাণী কিংবা ক্যাশিয়ার হতে হলে কেরাণীর জামা পরেই অফিসে আসতে হয়। তুমি থিয়েটার পাগল, তাই হিসেব কষতে গেলে সেই থিয়েটারের কথা মনে আসে তোমার, কিন্তু ভাই রাগ কোরো না, সত্যি কথা বলি, থিয়েটার থিয়েটার চিন্তা নিয়ে হিসেবের খাতা লিখলে খাতাটায় কোন হিসেবই মিলবে না।

এবার উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না অমর। একটু উঁচু স্বরেই বলে, আমাকে আপনি উপদেশ দিতে আসবেন না, কি হয়েছে তাই বলুন—

বড়বাবুর ছোট ভাই অমর দত্ত। মুৎসুদ্দি ধীরেন্দ্রনাথের ভাই অমর—এই কথাটা যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল অঘোর পাঠকের। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, না মানে বলছিলাম কি, এই হিসেবটা এমন ভুল করেছ, যদি না ধরতুম কোম্পানির অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। তাতে কি, ও আমি ঠিক করেই দিয়েছি—

অমর বলল, আমি ভুল করব না তো কে করবে? আপনাদের বড়বাবু যদি কেরাণীবৃত্তি ছাড়া আর কোন প্রতিভা নিয়ে জন্মাতেন তাহলে তিনিও বুঝতে পারতেন কেন এই ভুল হয়—এরপর আর যুবক অমরেন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়াবার সাহস পান না অঘোরবাবু। বয়সের তুলনায় সে একটু বেশী পাকা।

অমর ইদানীং অফিসের পর শুধু নাটক দেখে বেড়াচ্ছিল। কলকাতার যেখানেই নাটক সেখানেই দেখা যেত অমরেন্দ্রনাথকে।

সেদিন এমনি করেই একটা নাটক দেখতে গিয়ে এক পরম বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথ, যাকে একজন সাধারণ কেরাণী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি অমর, সেই তাকেই ঠিক এ ভাবে দেখবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, তাই যখন অঘোরবাবু কাছে এগিয়ে এলেন তখন অমরেন্দ্রনাথ বলল, আপনি এখানে কেন অঘোরবাবু?

অঘোর পাঠক বলেছিলেন, তুমি বড়বাবুর ছোট ভাই, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়, তবুও বলি, তুমি এই সময়ে সিটি থিয়েটারের সামনে কেন?

অমর বলল, থিয়েটার দেখব।

অঘোর বললেন, হাতে সময় নেই, ভিতরে যাই, পরে কথা বলব কেমন? আমি এখানে থিয়েটার করি। কথাটা শেষ করেই

অঘোরনাথ পাঠক অমরেন্দ্রনাথের চোখের সামনে দিয়ে সোজা চলে গেলেন সিটি থিয়েটারের ভিতরে।

বিস্ময়ে হতবাক অমরেন্দ্রনাথের সেদিন আর থিয়েটার দেখা হল না।

অঘোরনাথ পাঠকের কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন বাড়ি ফিরে এল অমর।

অঘোরনাথ পাঠক অফিসে বসে কাজ করছিলেন।

কাছে এসে দাঁড়াল অমর। খাতা থেকে চোখ তুলে অঘোর বললেন, কিছু বলবে?

অমরেন্দ্র বলল, অঘোরদা, আপনি ব্যস্ত আছেন?

অঘোরবাবু বললেন, হ্যাঁ কোন দরকার আছে?

অমর কিছুতেই আসল কথাটা বলতে পারছিল না। কেমন যেন একটা সংকোচ তাকে বার বার বাধা দিচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে মাথা চুলকে বলল, সেদিন রাগের মাথায় হিসেবের ব্যাপারে আপনাকে কটু কথা বলেছিলাম, আমার অন্যায় হয়েছিল। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—

অঘোরনাথ পাঠকের দু'চোখের মণি একরাশ কৌতূহলে চকচক করে উঠল। অমরের এই অপ্রত্যাশিত বিনয় অঘোরবাবুকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল। অঘোরবাবু বললেন, কি ব্যাপার বল দিকিনি—

অমর এবার নিজেকে অনেকটা শক্ত করে বলল, অঘোরদা, আপনি সিটি থিয়েটারের অভিনেতা, আপনার সঙ্গে কোন ব্যাপারে ঝগড়া করা উচিত নয়, তা ছাড়া আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট। বলছিলাম কি, থিয়েটারের অভিনেতাদের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

অঘোরবাবুর কৌতূহল আরও ঘনীভূত হল। বললেন, তা আছে বৈকি, কিন্তু সে খবরে তোমার দরকার কি বল তো।

অমরেন্দ্রনাথ এবার অঘোরবাবুর হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরল। অত্যন্ত আকুতির সঙ্গে বলল, অঘোরদা, আমাকে একদিন থিয়েটারের ভিতরে নিয়ে যাবেন? সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন? আমি থিয়েটারের ভিতরটা দেখব—

এবার অঘোরনাথ পাঠক চমকে উঠলেন! বললেন, ওরে বাবা! বল কি অমর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! তুমি তো আর যে সে ছেলে নও, খোদ বড়বাবুর ছোট ভাই। তোমাকে থিয়েটারের ভিতরে নিয়ে গেলে আমার যে সর্বনাশ হবে! না না, এসব অনুরোধ তুমি কোরো না।

অমর বলল, আমি থিয়েটারের ভক্ত, থিয়েটার আমার ভাল লাগে—

অবিচল অঘোরনাথ বললেন, তুমি ভুলে যেও না কালু যে তুমি বড়বাবুর ভাই।

এবার অমর ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠল। বলল, আমি বড়বাবুর ভাই বলে আপনি আমাকে থিয়েটারের ভিতরে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন কেন?

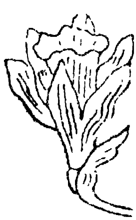
অঘোরবাবু সে কথার জবাব না দিয়ে আবার হিসেবের খাতায় চোখ রাখলেন।

আর কথা না বাড়িয়ে চলে এল অমর, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল সে। প্রতিজ্ঞা করে বসল, যেমন করেই হোক 'বড়বাবুর ভাই' পরিচয় থেকে সরে আসতেই হবে তাকে। সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকল অমর।

র‍্যালি কোম্পানিতে অমর যতদিন কাজ করেছে ততদিন কোন বন্ধু-বান্ধব সেখানে গিয়ে বিরক্ত করার সাহস পায়নি। হঠাৎ তারা কেমন সাহসী হয়ে গেল। সময় নেই অসময় নেই পার্শ্বচরেরা সেই র‍্যালি কোম্পানির ক্যাশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এক রকম জোর করে টেনে নিয়ে আসে অমরকে। কানে কানে যে মন্ত্র তারা ঢেলে দেয়

অমরেন্দ্রনাথ যেন সেই মন্ত্রেই বশ হয়ে যায়। অমর এতটুকু বুঝতে চায় না, অখ্যাত কুখ্যাত সব মেয়েমানুষের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বন্ধুরা তার টাকাগুলো শুধু ছিনিয়ে নিচ্ছে। যারা নটী নয়—অমর পূর্ণ বিশ্বাসে তাদের নটীর মর্যাদা দিচ্ছে।

একদিন কে যেন পরামর্শ দিল, এ সব তোকে ঠিক মানায় না কালু, বাগমারীতে তোদের নিজেদের অমন বাগানবাড়ি থাকতে তুই কিনা মেয়েমানুষের বাড়ি নিজে যাস, এটা কিন্তু ঠিক নয়—নিজে যেচে নটীদের বাড়িতে গেলে নটীরা পেয়ে বসবে, থিয়েটারের ভেতরের ছবিটা কিছুতেই ওরা তোকে বলবে না, কিভাবে থিয়েটার গড়তে হয় তাও ওরা তোকে বলবে না—তুই বরং তোদের বাগানবাড়িতে আড্ডা জমা, দেখবি কেবল নটেরা নয় কত নটীও তোর কাছে আসবে, থিয়েটার করা তখন কত সহজ হয়ে যাবে—



কথাটা ভাবিয়ে তুলেছিল অমরকে। যে ভাবনা সেই কাজ। অমর এবার বাগমারীর বাগানবাড়িতেই আড্ডা জমালো। কাঁচা টাকা উড়িয়ে, বন্ধুদের হাতে হাত রেখে বাঁকা পথ ধরেই ছুটতে আরম্ভ করল অমর আবার নতুন করে।

দেখতে দেখতে আসর জমে উঠল। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের মনে থেকে গেল অশান্তি আর অস্বস্তির একটা সুতীব্র জ্বালা। অমর মাঝে মাঝে বুঝতে পারে আসল কাজ হচ্ছে না। সে যা চায় বন্ধুরা সেই পথে তাকে টানছে না।

অমর একদিন বলল, তোমরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছ। তোমরা কেউ আমাকে বুঝতে চাইছ না। আমি থিয়েটার করব, আমি থিয়েটার গড়ব! তোমরা আমাকে পথ দেখাও—

বন্ধুরা বলেছিল, অপেক্ষা কর, সময়ে সব হবে। আর এসব করতে হলে খরচ তো করতেই হবে—

অমরেন্দ্রনাথ খরচে কার্পণ্য করত না। অফিসের আয়ের মোটা অঙ্কই কেবল নয় প্রায় প্রতিদিন দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে টাকা এনে সবটুকু ঢেলে দিত একটি মাত্র আশায়, ওরা পথ দেখাবে। মনের স্বপ্ন-সাধকে সার্থক করে তোলার পথে ওরা নিয়ে যাবে তাকে। কিন্তু থিয়েটারের আসর আর বসল না। বাগমারীর বাগানবাড়িটা একটা বেলেল্লাপনার ঘাঁটি হয়ে গেল। সেই সঙ্গে একটা অস্বস্তির তাড়নায় অমর যেন পাগল হয়ে উঠল। জুড়িগাড়িতে মেয়েমানুষ আসে। থিয়েটার নিয়ে সামান্য আলোচনা হয়, তারপর মদের গ্লাস আর কাচের চুড়িতে ঠুংঠাং শব্দ ওঠে।

এমনি করে আশায় আশায় থেকে, দু'হাতে অর্থ উড়িয়ে শুধু নিজের অস্তিত্বকেই নিংড়ে নিংশেষ করে ফেলতে লাগলেন অমরেন্দ্রনাথ।

প্রতিবাদ করে সব বন্ধ করে দিলে যদি হিতে বিপরীত কিছু হয় সেই ভয়ে অমরেন্দ্রনাথ শুধু নীরবে আড্ডার চেহারাটাকে বাঁচিয়ে রেখে চললেন। ভিতরে ভিতরে ক্ষীণ হয়ে যেতে থাকলেন অমর দত্ত। এদিকে দত্তবাড়িতে তখন অন্য প্রস্তুতি চলছে।

রক্ষাকালী বললেন, তাহলে আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন ঘটক মশাই। এ বিয়েতে কারও অমত নেই। আপনি মিত্তির মশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে পাকা দেখার ব্যবস্থা করুন—

বৃদ্ধ ঘটক মহাখুশি হলেন। হাতজোড় করে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, বেশ তাই হবে কর্তামা, সত্যি কথা বলতে কি কালুর বিয়ে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেব এ কি আমার কম ভাগ্য?

এরপর কালুর বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ছেলের অজান্তে মা সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেললেন।

তারপর এক সময়ে ছেলের কাছে এসে রক্ষাকালী বললেন, আগে আগে অপিস থেকে বাড়ি এসে আমার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যেতিস না, ইদানীং দেখছি আমার হাতে জলখাবারটুকুও তোর খেয়ে যাবার সময় হয় না, তোর সঙ্গে যে দু'দণ্ড কথা বলব, আলোচনা করব সে সুযোগও পাই না বাবা—

অমর সেই মুহূর্তে মায়ের মুখের চেহারাটা দেখে একটু দুর্বল হলেন। তবুও নিজেকে শক্ত করে বললেন, দেখ মা, সবাই বলে আমি তোমার উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, এই সংসারে আমার যে কোন মূল্য নেই তাও বুঝি, আর বুঝি বলেই এমন একটা কিছু নিয়ে থাকতে চাই যা আমাকে সংসার থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে। আমার কিছু ভাল লাগে না মা, বন্ধু-বান্ধব-থিয়েটার এসব নিয়ে আমি ভালই আছি, আমাকে তাই থাকতে দাও মা—

কথা বলতে বলতে একটু একটু করে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন অমরেন্দ্রনাথ। বললেন, একটা জিনিস তুমি দেখেছ কি না জানি না মা, বড়দাদা-মেজদাদা কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না, আমাকে দেখলেই ওঁদের চোখে মুখে কেমন যেন একটা ঘৃণা ফুটে ওঠে। তাই যতক্ষণ বাইরে থাকা যায় ততক্ষণই শান্তি—

রক্ষাকালী বেশ শান্ত মেজাজে বললেন, এ সব তুমি মনে কর কেন বাবা—মনকে যেমন চালাবে তেমনি চলবে, তুমি যাদের খারাপ মনে করছ তারা হয়তো তেমন খারাপ নয়—

এসব উপদেশ ভাল লাগে না অমরের। একটা বিরক্তির ছাপ চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অমর নিজেকে সহজ করে বললেন, কি বলতে চাও মা তাই বল, আমার আবার আপিসে যাবার সময় হয়ে গেল—

রক্ষাকালী সোজাসুজি বললেন, আমি তোমার বিয়ের বিষয়ে কিছু বলতে চাই—

অমরেন্দ্রনাথ হাসলেন যেন ভীষণ মজার কোন কথা শুনেছেন। হাসি থামিয়ে বললেন, আমার বিয়ে! এ তুমি কি বলছ মা! যে ছেলে, মা বড়দাদা মেজদাদা এমন কি সংসারের বশ নয়, যে এই অল্পবয়সে তোমাদের কাছে, আত্মীয় স্বজনের চোখে উচ্ছৃঙ্খল, অপদার্থ, —তার বিয়ে দিয়ে একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে চাইছ কেন মা?

রক্ষাকালীর মুখখানা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবুও নিজেকে সংযত করে বললেন, আমার কথা রাখো বাবা, এ বিয়েতে তুমি অমত কোরো না—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, বেশ, তুমি ব্যবস্থা কর, আমি আর আপত্তি করব না। কথাটা শেষ করে একটু হেসে বললেন, মা, তুমিই তো বলেছ, এ সংসারে কেউ কারও আপন নয়। আপন দাদারা যখন আপন হয় না, তখন বাইরের একটি মেয়ে আমার স্ত্রী হয়ে আসতে পারে বটে কিন্তু আপন হবে কি করে! কেমন করে আমি তাকে বিশ্বাস করব? আমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে যে আসবে সে যদি তার স্বার্থ নিয়ে আসে, সে যদি আমার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হয়, তাহলে! তখন সেই সর্বনাশ থেকে তাকে কে বাঁচাবে মা—

রক্ষাকালী বললেন, সে তোমার ভাগ্য বাবা। তবে একটা কথা, সব মেয়েই সমান নয়। মেয়েরা অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে স্বামীদের অন্যায় ব্যবহারে, অত্যাচারে। সে সুযোগ তুমি যদি না দাও বাবা, দেখবে তোমার বৌয়ের মত সুখী আর কেউ নেই।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, কথা দিলাম মা, তুমি যা চাইছ তাই হবে। তবে মেয়ে দেখব না,—যার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে আমি তাকেই বিয়ে করব।

রক্ষাকালী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

অমরেন্দ্রনাথের বিয়ের দিন এগিয়ে এল।

সানাই বাজল। উৎসব মুখরিত দত্তবাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। বাজি পুড়ল। বন্ধুদের জলসায় বাসরঘর জমজমাট হয়ে উঠল। অর্থে সামর্থে প্রাচুর্যে প্রখ্যাত জয়নারায়ণ মিত্রের পৌত্রী, ক্ষীরোদপ্রসাদ মিত্রের মেয়েকে বটতলার বাড়ি থেকে বরণ করে নিয়ে এলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

যে বয়সে এযুগের মেয়েরা পুতুল খেলা করে ঠিক সেই বয়সের বালিকা হেমনলিনী তার একান্ত আপনার গণ্ডি ছেড়ে এসে দাঁড়াল এক অপরিচিত অলিন্দে। সারা মনে এক অজানা অনুভূতি। দুটো গভীর কালো চোখে কতই না স্বপ্ন!

সেদিন ফুলশয্যা।

গোটা বাড়িতে বিয়ের উৎসব তখন ভরা যৌবনের মত টল টল করছে। সেই মুহূর্তে লাল বেনারসীতে মোড়া ফুলসাজে সজ্জিতা বালিকা হেমনলিনী যেন এক অনুপম কবিতা। সবাই আসছে, দেখছে, ভালবাসছে আবার ফিরে যাচ্ছে। উপঢৌকনের স্তূপে যেন একটু একটু করে চাপা পড়ে যাচ্ছে সেই একরত্তি মেয়েটা। ওকে ঘিরে বালিকা বধূদের যে ভীড়, ওকে নিয়ে প্রবীণাদের যে হাসি ঠাট্টা সব কিছুই হেমনলিনীর কাছে নতুন, যেন স্বপ্নের মত।

বৌ-ভাতের দিন এমনি করে চুপটি করে বসে থাকা নিয়ম, আর সেই নিয়মের চাপে ভিতরে ভিতরে কচি মেয়েটা একটু একটু করে ক্লান্তিতে ক্ষয়ে যাচ্ছে। দু'চোখের মণিতে কি যেন, কাকে যেন

খোঁজার চেষ্টা তার। হয়তো যার হাত ধরে সে এই নতুন বাড়িতে এসেছে তাকেই খুঁজছে মনে মনে। সে অমর। অমর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়িতে নেই।

হেমনলিনীকে ঘিরে সেই ঘরে সেই মুহূর্তে যে ছবি ফুটে উঠেছে, আস্তাবলের ভেতরে সেই আবছা আলো-আঁধারে তখন আর এক ছবি।

অমর তখন আস্তাবলের সেই গোপন আসরে বন্ধুদের নিয়ে মেতে উঠেছে চিরন্তন উল্লাসে। পরনে গরদের পাঞ্জাবী আর ফরাসডাঙ্গার কোঁচানো ধুতি। যাকে ঘিরে দত্তবাড়ি উৎসব মুখরিত সেই যুবক অমরেন্দ্রনাথ সব আনন্দ উৎসবের বাইরে এসে নিজের গড়া রাজত্বে যেন তখন একচ্ছত্র অধিপতি। আস্তাবলের গোপন আসরে অমর দত্ত নিশ্চিন্ত আরামে তখন গড়গড়ায় ধূমপানে ব্যস্ত।

দ্রুত গিরিধারী এসে ঢুকল আস্তাবলে। অমরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল তৎক্ষণাৎ, অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললেন, এখানে কেন ?

গিরিধারী বারকতক ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বলল, সবাই তোমাকে খুঁজছে আর তুমি কিনা এখানে বসে আছ ? রাত কত হয়েছে একবার ভেবে দেখেছ ? খেতে-শুতে হবে না ? আজ তোমার ফুলশয্যে সে খেয়ালও নেই ?

অমরের সম্বিৎ ফিরল। কেমন যেন একটা ভয়ের ছাপ চোখে মুখে ফুটে উঠল।

মুখে তামাকের গন্ধ নিয়ে বাড়ির ভেতরে গেলে যদি কেউ ধরে ফেলে সেই ভয়। পকেট থেকে আতর ছড়ানো রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে আস্তাবলের আড্ডা থেকে নিতান্ত চোরের মত বেরিয়ে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ।

ওদিকে সুদীর্ঘ সময় নীরবে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্তিতে হেমনলিনীর দেহটা ভেঙে পড়ছিল। তারপর একা ঘরে শুয়ে পড়ল হেমনলিনী। একরাশ ফুলের মধ্যে যেন একটা ঘুমন্ত প্রজাপতি। গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গেল বালিকা হেমনলিনীর অবসন্ন দেহটা।

হেমনলিনী ঘুমোচ্ছে। অমর তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। অমরের দু'চোখে বিস্ময়। একটা অপরূপ ছবি দেখার মত সেই দৃষ্টি। হেমনলিনীর মুখখানা অবাক হয়ে দেখছিলেন অমর দত্ত। যৌবনের প্রথম সোপানে দাঁড়িয়ে একটা অনিন্দ্যসুন্দর অনুভূতি যেন তাঁকে আত্মভোলা করে দিয়েছিল সেই মুহূর্তে। চন্দনের ফোঁটা আঁকা মুখ, নাকে নথ, সিঁথিতে সিঁদুর রেখা, কপালে সিঁদুর বিন্দু, একরাশ ঘন কালো চুলের বেণীতে রজনীগন্ধা জড়ানো, লাল বেনারসীতে ঢাকা অপরূপা হেমনলিনীর ঘুমন্ত মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন অমর। এবার আস্তে আস্তে সেই কিশোরীর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করলেন তিনি। মুহূর্তে সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠল তাঁর। মুখ সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে ওদিকে তাকালেন অমর। দরজা বন্ধ। নিঃশব্দ চারিদিক। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন ঠিক তখনই এই ঘরে ষোল বছরের যুবক অমরের মনে একটা কিসের যেন আলোড়ন। আবার ভাল করে দেখলেন হেমনলিনীর মুখখানা। আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন তিনি।

যতবারই হেমনলিনীকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করেন ততবারই হেমনলিনীর সেই ঘুমন্ত মুখের ওপরে কিলবিল করে ওঠে অমরের অতীতগুলো। সেই বাঈজীদের মুখ, পার্শ্বচরদের উল্লাস। অনেক চেষ্টা করেও সেই রাত্রে হেমনলিনীকে ভাল করে দেখা হল না। ভাল করে জানা হল না সেই নবাগতাকে।

একরাশ অস্বস্তি নিয়ে অমরও একসময়ে শুয়ে পড়লেন সেই ফুলে ফুলে ঢাকা পালঙ্কের একপাশে। এই মুহূর্তের অমরকে দেখে মনে হল যেন মালা গলায় ক্লান্ত এক সভাপতি বিশ্রাম করছেন।

এ যেন অন্য মানুষ।

ইদানীং অমরের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে দেখে সবাই নিশ্চিন্ত।

অমর হঠাৎ নিজেকে অনেকটা আলাদা করে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব জগৎ থেকে। এখন অফিস থেকে সোজা বাড়িতেই চলে আসেন তিনি। তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তনের হেতু সবাই না জানলেও অমর নিজে তা জানতেন, কিন্তু কোন মতেই মনের সেই গোপন কথাকে ব্যক্ত করতে পারতেন না। সবাই লক্ষ্য করতেন অমর কোথায় যেন বড় দুর্বোধ্য। নিজেকে শুধরে নিলেও কোথায় যেন একটা গভীর বেদনা আছে তাঁর। সে বেদনা ঐ হেমনলিনীকে নিয়ে। যার জন্যে নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা, যার জন্যে বাড়ী ফেরা, তাকেই এক মুহূর্তের জন্যও কাছে না পাবার যে যন্ত্রণা তা প্রকাশ করতে পারতেন না অমরেন্দ্রনাথ। কিন্তু সেদিন কেমন করে যেন তা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

অফিস থেকে অনেক আগেই বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে শুয়ে পড়লেন অমর। ছেলে অসুস্থ আশঙ্কা করে ছুটে এলেন রক্ষাকালী। বললেন, কি হয়েছে বাবা? অমর বলেছিলেন, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা মা—

মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। এ ব্যাপারটা ভাল লাগেনি অমরের। তিনি যা চেয়েছিলেন, যা ভেবে এই মিথ্যের বেসাতি তা হল না, আর সেই কারণেই ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিলেন অমর।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চতুর বৌদিরা সে দৃশ্য দেখেছিলেন, ওরা বুঝেছিলেন অমরের এ যন্ত্রণা কিসের। বড় আর মেজবৌদি পরস্পর পরামর্শ করে হেমনলিনীকে ডেকে বলেছিলেন, ছোট শোন—যা না ভাই, তোর কর্তার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে আয় না—

মেজবৌদি বললেন, মা বুড়ো মানুষ, কতক্ষণ বসে বসে হাত বুলিয়ে দেবেন বল, কোমরে বাত হবে যে—

হেমনলিনী চাপা স্বরে বলেছিল, আমার লজ্জা করে!

বড়বৌদি বলেছিলেন, কিসের লজ্জা ? ও তোর স্বামী. স্বামী সেবা করলে মেয়েদের পুণ্যি হয়। হেমনলিনীর ডাগর দু'চোখের মণিতে বিশ্বাসের আলো জ্বলে উঠল। এমনি ধরনের একটা ছাড়-পত্রের প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করার সামর্থ ছিল না। এ বাড়ির বড়বৌ সেই ছাড়পত্র দিতেই একরাশ খুশিতে হেমনলিনীর চোখজোড়া চক চক করে উঠেই আবার ম্লান হয়ে গিয়েছিল। হেমনলিনী বলল, দিদি আমি যাব না, আমাকে উনি বকবেন--

মেজবৌ এ কথার মধ্যে একটা রস পেলেন। চোখ মটকে বললেন. ছোট, তোর পেটে পেটে অত ছিল ? এ অনুরাগ আমরা দেখাতে পারিনি—

বড়বৌ বললেন, না ভাই বকবে না, তুই যা—যা না—

কথাটা শেষ করে হেমনলিনীকে একরকম জোর করে অমরের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিলেন ওঁরা। ঘরে এসে বালিকা হেম লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রক্ষাকালী বললেন, এস মা, এস।

হেমনলিনীকে দেখে অমরের সারা মনে একটা খুশির হিল্লোল বয়ে গেল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়াল হেমনলিনী। চাপা স্বরে বলল, মা, বড়দিদি বললেন আপনার কোমরে ব্যথা, আপনি ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নিন—

কথা শুনে মৃদু হাসলেন রক্ষাকালী। সে যুগের মেয়ে হলেও বালিকা বধূর মনের কথা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র দেরী হল না। ছোট বৌ-এর মুখের ওপর সস্নেহে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মনটাকে নিশ্চিন্ত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রক্ষাকালী।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন অমর। হেমনলিনী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। অমর দেখলেন। তারপর শুরু করে দিলেন সেই মাথা ব্যথার মিথ্যে অভিনয়।

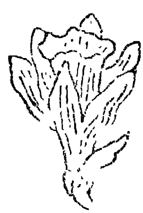
হেমনলিনী এবার চঞ্চল হয়ে পড়ল। আস্তে করে বলল, বড়দিদি বললেন আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে—

এবার অমর সোজা হয়ে বসলেন। বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন, আচ্ছা, তুমি তখন থেকে শুধু দিদি বললেন-দিদি বললেন করছ কেন বলত ?

হেমনলিনী বলল, হ্যাঁ, বড়দিদি মেজদিদি দুজনেই আমাকে বললেন আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে—

এবার অমরেন্দ্র একটু উত্তেজিত হলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, দিদি না বললে তুমি আমার কাছে আসবে না ? তা যদি না আস তবে বৌঠানরা বললেও তুমি এস না হেম, তুমি যেতে পারো—

হেমনলিনী বলল, তাহলে আবার মাকে ডেকে দিই ? কথাটা শেষ করে হেমনলিনী চলে যাচ্ছিল। বাধা দিলেন অমর। ওর একখানা হাত শক্ত করে চেপে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে এলেন অমর। মুখর সমুদ্রে এসে মূক নদীটা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।



এ আর এক অমর দত্ত। ছেলেবেলা থেকে যে অমর অস্বাভাবিক দুরন্তপনা, অস্থিরতায় সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছিলেন, উনিশ বছরের যৌবনে সেই অমর সহসা কেমন যেন স্থির হয়ে গেলেন।

ইদানীং আর এক খেলায় মেতে উঠেছেন অমর। লেখা-লেখা খেলা।

হেমনলিনী যখন ঘুমিয়ে থাকে, অমর তখন তলিয়ে যান আর

এক সৃষ্টির নেশায়। এমনি করেই সেদিন লিখতে লিখতে রাত কাটিয়ে দিয়েছিলেন অমর। দেওয়াল ঘড়ির ঢং ঢং শব্দে সম্বিত ফিরলে অমর কাগজ থেকে চোখ তুলে বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের সামনে একটু একটু করে অন্ধকার কেটে গিয়ে কেমন করে দিনের আলো ফুটেছিল তাও দেখেছিলেন তিনি—

আর একদিনের কথা।

অমরেন্দ্রনাথ অফিসের টেবিলে সেই লেখার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। কখন যে ছুটি হয়ে গেছে, গোটা র‍্যালি কোম্পানি ফাঁকা করে দিয়ে কখন যে সবাই চলে গিয়েছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না অমরেন্দ্রনাথের।

ধীরেন্দ্রনাথ ছোটভাইকে একলা বসে থাকতে দেখে কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, কালু, তুমি এখনও বাড়ি গেলে না ?

অমর বললেন, আমি নাটক লিখছি বড়দাদা, আপনি শুনবেন কেমন লিখছি ?

চমকে উঠলেন ধীরেন্দ্রনাথ। আর এক নতুন খেয়ালে অমরকে মেতে উঠতে দেখে ধীরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হলেন।

অমর আবার বললেন, এ যে সে নাটক নয়, গীতিনাট্য। কি নাম রেখেছি জানেন ? উষা। আপনি একটু বসুন, আমি আপনাকে নাটক শোনাব—

এবার উত্তেজিত হলেন ধীরেন্দ্রনাথ। রাসভারী স্বরে বললেন, তোমার এই সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সংসার সম্বন্ধে যে উদাসীন, যে নিজের স্ত্রীর প্রতিও কোন কর্তব্য করে না, আমি তার কোন ব্যাপারেই উৎসাহী হতে পারি না। তুমি বাড়ি যাও, কোম্পানির ঘরে বসে এসব ছাইপাঁশ ব্যক্তিগত কাজ করা আমি পছন্দ করছি না—

সেদিন একরকম জোর করে অফিস থেকে অমরকে বার করে দিলেন ধীরেন্দ্রনাথ। অমরেন্দ্রনাথ দাদার এই ব্যবহারে ভিতরে

ভিতরে উত্তেজিত হলেন কিন্তু সে উত্তেজনা প্রকাশ না করে নীরবে বেরিয়ে গেলেন অফিস থেকে।

লেখা থামেনি অমরেন্দ্রনাথের। সব সময় অমরেন্দ্রনাথ লেখা নিয়ে ব্যস্ত। কারও দিকে তাকাবার অবকাশটুকুও নেই। এমন কি খাওয়া, স্নান করা, নিয়মিত অফিসে যাওয়াটাও একটা অনিয়মের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বাড়ির কেউ অমরের সঙ্গে একদণ্ডের জন্য কথা বলারও সাহস পাচ্ছেন না। সবাই যেন অমরের নামে ভীত সন্ত্রস্ত। এমনকি হেমনলিনীর সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই অমরেন্দ্র নাথের। ব্যাপারটা সকলকেই রীতিমত ভাবিয়ে তুলল। রক্ষাকালীর মনটা একরাশ ব্যথায় টনটন করে উঠল। ব্যথা হেমনলিনীর জন্য। একরত্তি মেয়েটা স্বামীর ব্যবহারে সংসারের সব আনন্দ থেকে সরে গিয়ে ভিতরে ভিতরে যে ক্ষয়ে যাচ্ছে তা মুখে প্রকাশ না করলেও রক্ষাকালীর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইদানীং মাঝে মাঝেই হেমনলিনী লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলে তাও একদিন রক্ষাকালীর চোখে ধরা পড়ে গেল।

অমরের এই ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রক্ষাকালী মনে মনে ঠিক করলেন কিছুদিনের জন্য হেমনলিনীকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

সংসারের সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ একসময়ে লেখা শেষ করলেন। মেতে গেলেন আর এক খেয়ালে। প্রথম লেখা সেই 'ঊষা'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে অমর ছুটে বেড়ালেন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। চেনা জানা সব মহলে সেই গীতিনাট্য শুনিয়ে বেড়াবার কাজে মত্ত হয়ে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথ।

বন্ধুরা বিস্মিত হল। অনেকের কাছে আবার তিনি বিদ্রূপের পাত্র হয়েও উঠলেন। অমরেন্দ্রনাথ তবুও অবিচল।

ব্যাপারটা মতিলালকে ভাবিয়ে তুলল।

ঘটনাটা যে ভাবে চলছিল আর দু'চারদিন চললে মতিলাল যে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তা অকল্পনীয়। আর সেই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় মতিলাল আর চুপ করে থাকতে পারেননি। মতিলাল ঘোষ। হীরেন্দ্রনাথের বন্ধু। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক।

মতিলাল ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার তাগিদে ছুটে এলেন হীরেন্দ্রনাথের কাছে। এমনি করে মাঝে মাঝেই মতিলাল আসতেন হীরেন দত্তের কাছে। সেদিন মতিলালবাবুকে মেজদাদার ঘরে দেখে দরজার পাশে থমকে দাঁড়ালেন অমর। যাঁরা লেখেন, যাঁরা সাহিত্য করেন এখন তাঁরাই অমরেন্দ্রনাথের চোখে মহান চরিত্র। তাঁদের ঘিরে কতই না কৌতূহল অমরের। আর তেমনি কৌতূহল নিয়েই অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল ঘোষকে দেখছিলেন অমর।

ঘরের ভিতরে ওঁরা কথা বলছিলেন। মতিলাল বললেন, ব্যাপারটাকে তুমি যতই সহজ করে নাও হীরেন, আসলে তা আর ততটা সহজ নেই এখন। অনেকদূর এগিয়েছে। তুমি দেখছ না ওরা এর মধ্যে গোটা কলকাতাকে কেমন গরম করে তুলেছে, আর আমি? আমি শুধু কপাল চাপড়াচ্ছি—

হীরেন্দ্রনাথ বললেন, মতিলাল, ডোণ্ট গেট নারভাস, তুমি অল্পতেই বড় ভেঙে পড়। কিন্তু আমি ভেবে পাই না যে, যার হাতে অমৃতবাজারের মত কাগজ সে অত দুর্বল হয়ে পড়বে কেন?

ওরা তো ভোটের প্রচারের নামে তোমার বিরুদ্ধে বস্তা বস্তা গালাগাল ছড়াচ্ছে, মিথ্যে প্রচার করছে, এতে ওরা নিজেদের মনের নীচতাকেই প্রকাশ করছে—

মতিলাল বললেন, আমি যদি একজন ছড়া-লিখিয়ে পেতাম তাহলে ঐ মিথ্যে প্রচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাল্টা জবাব দিতাম—

মতিলালের কথা শেষ হতে না হতেই আবৃত্তি করতে করতে নাটকীয় ভঙ্গিমায় ঘরে ঢুকলেন অমরেন্দ্রনাথ।

মতিলাল আর হীরেন্দ্রনাথ উভয়েই স্তম্ভিত। মতিলাল একটা কিছু বলতে চাইছিলেন, পারলেন না। অমরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, এ আমার কথা নয় মতিলালবাবু, এ আপনার কথা।

মতিলাল ঘোষের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। বললেন, এ আমার কথা মানে? পরক্ষণেই মতিলালের কাছে সেই আবৃত্তির কথাগুলোর অর্থ যেন স্পষ্ট হয়ে গেল। চঞ্চল হয়ে পড়লেন মতিলাল। অত্যন্ত অধীর আগ্রহে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ কালু, তুমি ঠিক বলেছ—ও আমার কথা, আর একবার ওটা শোনাও—

অমরেন্দ্রনাথ আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন—

"যোগ্যজনে কার্যক্ষেত্রে হয় অগ্রসর
মূর্খজনে করে শুধু মুখে আড়ম্বর"—

মতিলাল মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হলেন। যুবক অমরেন্দ্রনাথকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে বললেন, পেয়েছি, আমি যা চাইছিলাম পেয়েছি—

এ দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হীরেন্দ্রনাথ নিজেকে বড় দুর্বল ভাবছিলেন তখন। এবার মুখ খুললেন হীরেন্দ্রনাথ। বললেন, মতি, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? কেন ওর কথাকে এত প্রাধান্য দিচ্ছ বুঝতে পারছি না—

অমরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মেজদাদা আমাকে ভালবাসেন বলেই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন না, কিন্তু মতিলালবাবু আমি আপনাকে

কথা দিচ্ছি, এমন ছড়া লিখব, এমন কথা বলব—এমন ভাবে আমি নিজে আপনার জন্যে পথে নেমে প্রচার করব যা দেখলে শুনলে ঐ ভূপেনবাবুরা আর মিথ্যে প্রচার করতে সাহস পাবেন না। অন্যায়ের জবাব অন্যায় দিয়েই দেব; ওরা খেমটা নাচিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে আমি তা আমার পাল্টা জবাবে বন্ধ করে দেব—

মতিলালের দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল আনন্দের অশ্রু। আশীর্বাদ করলেন অমরেন্দ্রনাথকে।

এক নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার পদের জন্য ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন মতিলাল ঘোষ; তাঁর বিপক্ষে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। অর্থবান পুরুষ। অর্থের দাপটে খেমটা নাচিয়ের দল ছেড়েছিলেন পথে। পাড়ায় পাড়ায় ঢাক ঢোল আর কাঁসি বাজিয়ে খেমটা নেচে তারা একরাশ মিথ্যা অপবাদ আর গালাগাল ছড়িয়ে যাচ্ছিল মতিলালের বিরুদ্ধে।

যথা সময়ে অমরেন্দ্রনাথও ঝাঁপিয়ে পড়লেন সদলবলে ঢাক-ঢোল আর কাঁসি নিয়ে। স্বরচিত ছড়ায় ওদের মিথ্যে প্রচারের মুখ বন্ধ করে দিলেন অমরেন্দ্রনাথ। মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল যুবক অমরেন্দ্রনাথের কীর্তি।

এরপর আবার সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে অমরেন্দ্রনাথ যেন লেখার সাগরেই একান্তে পাড়ি জমিয়ে দিলেন। সেদিন তেমনি লিখতে লিখতে হঠাৎ চমকে উঠলেন অমরেন্দ্রনাথ। একটা চাপা কান্নার আওয়াজে সম্বিত ফিরল তাঁর। চোখে মুখে একটি প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল, কে কাঁদছে!

গভীর ঘুমের ভিতরে কাঁদছিল হেমনলিনী। ওর পাতলা ঠোঁট দুটো চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অমরেন্দ্রনাথ লেখা ছেড়ে হেমনলিনীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভাল করে দেখলেন তাকে।

একরাশ না-বলা ব্যথা আর স্বপ্ন নিয়ে রোজই যেমন একলা একলা ঘুমিয়ে থাকে হেমনলিনী আজও তেমনি করে ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ করি স্বপ্ন দেখছিল। সেই না-বলা ব্যথার স্বপ্ন।

অমরেন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে ডাকলেন, হেম—হেম—

যন্ত্রচালিতের মত উঠে বসল হেলনলিনী।

অমরেন্দ্রনাথ শান্ত স্বরে বললেন, হেম, কি হয়েছে তোমার? চোখে জল কেন? কোন স্বপ্ন দেখেছ তুমি?

হেমনলিনী এবার যেন নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এল। মুখ ফুটে যা কোনদিন বলতে পারেনি হেমনলিনী, আজ তা নিতান্ত ছেলেমানুষের মত প্রকাশ করে ফেলল। যা মুখ ফুটে কোনদিন চেয়ে নিতে পারেনি আজ তা জোর করে আদায় করে নিল। দু'হাত দিয়ে একান্ত আপনার জন অমরেন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরল হেমনলিনী, তারপর ওঁর বুকের ওপর মাথা রেখে কাদতে কাঁদতে এক সময়ে একাকার হয়ে গেল। অমরেন্দ্রনাথের গোটা দেহটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি যেন একটু একটু করে লীন হয়ে যেতে থাকল আরেক তৃপ্তির সঙ্গে। চোখ বুজল হেমনলিনী। চোখ বুজলেন অমরেন্দ্রনাথও। এ বাড়িতে যেন এই প্রথম একটা স্মরণীয় রাত নেমে এল।

গিরিশ ঘোষ অশান্ত।

অশান্ত গিরিশ ঘোষ সারা ঘরময় পায়চারি করছিলেন। মানসিক কোন অস্বস্তি থাকলেই গিরিশবাবু ঠিক এমনি করেই অশান্ত হয়ে

পড়েন। অনেকক্ষণ পায়চারি করে অবশেষে আপন মনেই বললেন, যত ভাবি ভাবব না, ততই যেন ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে কিলবিল করে—ধুস্ শালা! যার ভাবনা সেই ভাবুক, আমার কি—কথাটা বলে আলমারী থেকে একটা মদের বোতল বার করে সেই বোতলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ইউ জাস্ট থিঙ্ক ইওরসেলফ্।

তারপর বোতলটা তুলে ধরলেন গলায় মদ ঢেলে দেবার জন্য। কিন্তু হল না। মদ খাওয়া হল না তাঁর। অমরেন্দ্রনাথকে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমটা বিস্মিত হলেন তারপর নিজেকে সংযত করে মদের বোতলটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, কে! ওঃ কাল, এস—

অমরেন্দ্রনাথ দ্বিধা জড়িত পদক্ষেপে ভিতরে এল।

গিরিশবাবু বললেন, কি চাই তোমার? আমার বাড়িতে কেন এসেছ?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আপনার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এসেছি। বলুন আমার আবেদন রাখবেন—

গিরিশবাবু বললেন, বোসো, আগে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিই—বলে গ্লাসের মদটা গলায় ঢেলে দিলেন। বললেন, জানি না কি আবেদন নিয়ে তুমি এসেছ, তবে ধীরেন দত্তের বাড়ির কেউ যে আমার দ্বারস্থ হবে আমি তা জানতাম—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি থিয়েটার ভালবাসি বড়দা তা পছন্দ করেন না, আর তাই তো সবার কাছে আমি মাথা নিচু করে নীরবে দিন কাটাচ্ছি, আপনি আমাকে সাহায্য না করলে আমি শান্তি পাচ্ছি না—

গিরিশ ঘোষ আবার খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিলেন। বললেন, বল তোমার কি আবেদন?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি একখানা কাগজ ছাপতে চাই। আমাদের এখানে ভাল পত্রিকার অভাব। একটা পত্রিকা প্রকাশ

করলে অনেকে লিখতে পারবেন, মনের কথা প্রকাশ করতে পারবেন, আমরাও আমাদের নানা সৎ-প্রচেষ্টার প্রচার চালাতে পারব, আপনি দয়া করে পত্রিকার দায়িত্ব নেবেন কথা দিন। কাগজের নাম ঠিক করেছি 'সৌরভ'।

আমি পত্রিকা ছাপাবার খরচ বহন করতে সক্ষম, কিন্তু আপনি যদি পত্রিকার সম্পাদক হন তাহলে আমার আশা ষোল আনা পূর্ণ হয়।

গিরিশ ঘোষ বললেন, আমি রাজী, তুমি সেই চেষ্টাই কর—

ঠিক এমন একটা কিছু ঘটবার প্রতীক্ষায় ছিলেন গিরিশচন্দ্র। একটা জবাবের প্রতীক্ষা।

অমর দত্তকে কথা দেবার পরমুহূর্তেই যেন সব নেশা ছুটে গেল গিরিশ ঘোষের। নিজেকে সম্পূর্ণ সহজ করে উঠে এলেন যুবক অমরের কাছে। ওর কাঁধের ওপরে একটা হাত রেখে বললেন, তুমি কি বুঝতে পারছ, কেন এত সহজে আমি তোমার কথায় রাজী হয়ে গেলাম ?

অমরের চোখে শুধু একরাশ প্রশ্ন। গিরিশচন্দ্র এবার আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলেন না।

পুরনো একটা ছবি যেন গিরিশচন্দ্রের ভিতরকার মানুষটাকে উত্যক্ত করে তুলল। গিরিশচন্দ্র বললেন, আমি জানতাম তুমি আমার কাছে আসবে, আর তোমার সব আব্দার সহজে মেনে নিয়ে তোমার স্বপ্নের রাজ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে আমি তোমার দাদা ধীরেন্দ্রনাথের অপমানের প্রতিশোধ নেব।—

তারপর সব কথাই খুলে বললেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সে অনেকদিন আগের কথা। গিরিশচন্দ্র তখন একটা থিয়েটার গড়ার জন্য রীতিমত মরীয়া হয়ে উঠেছেন। লোকবল থাকলেও অর্থবল এতই নগণ্য যে গিরিশচন্দ্র কিছুতেই সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারছিলেন না। নিজের মনের সংগে বার বার যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত তিনি সোজা হাজির হয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথের কাছে।

আত্মীয়তার সূত্র ধরে গিরিশচন্দ্র ধীরেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হাত পেতে ছিলেন কিছু টাকার জন্যে। অনুনয়ের সুরে বলেছিলেন, ধীরেন, একটা থিয়েটার, একটা জাতীয় থিয়েটার গড়ার জন্য তুমি আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করো—

প্রথমটা রাজী হয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, আমি তো থিয়েটারের ভিতরের চেহারাটাকে জানি না, আপনি চাইছেন বলেই আমি আপনাকে নিরাশ করব না। গিরিশচন্দ্র এরপরই একদিন ধীরেন্দ্রনাথকে সাদরে নিয়ে গিয়েছিলেন থিয়েটারের ভিতরকার চেহারা দেখাবার জন্য। সেই বোধ করি কাল হয়েছিল। থিয়েটারের ভিতরে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ক'টা নোংরা দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধীরেন্দ্রনাথ ভিতরে ভিতরে তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর এক সময় গিরিশচন্দ্রের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন, থিয়েটার আপনার কাছে তীর্থ হতে পারে, আমার কাছে থিয়েটার হলো নোংরামীর প্রতীক—আসলে ধীরেন্দ্রনাথ সেদিন গিরিশচন্দ্রকে শুধু অপমান ছাড়া আর কিছুই দিতে চাননি। অপমানে উত্তেজিত গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, যে থিয়েটারকে তুমি অপমান করলে, একদিন সেই থিয়েটারে তোমার বংশের এমন একজনকে নিয়ে যাব, যার সংগে তোমার রক্তের সম্পর্ক, থিয়েটার নিয়ে তার মাতামাতি তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

এবার নিজেকে সংযত করলেন গিরিশচন্দ্র। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অমরেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন ; বললেন, আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার দিন এসেছে—

ভারাক্রান্ত অমরেন্দ্রনাথ তার পুরনো আড্ডায় এসে হাজির।

অমরেন্দ্রনাথকে দেখে প্রায় সকলেই একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল, আমাদের কালুবাবুর জয়—

অমরেন্দ্রনাথ এসব কানে তুললেন না। বললেন, অনেককেই তো দেখছি না—

একজন বলল, দেখবে কি করে? দু'বছর আগে যা দেখে গিয়েছিলে তুমি কি ভেবেছ তা সবই তেমনি থাকবে? তোমার নিজের পরিবর্তন হতে পারে আর আমাদের আড্ডাখানার পরিবর্তন হবে না এ আশা করাই তো অন্যায়—

কথাটা শেষ করে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল অমরেন্দ্রনাথের।

বন্ধুটি বলল, মাইরি বলছি, তুইও আর আসিস না, আড্ডার সেই মেজাজটাও আর পাওয়া যায় না—তা, ছড়া-কবিতা-বৌ সব কিছু রেখে হঠাৎ এলি কেন বল দিকিনি?

অমরেন্দ্রনাথ বিরক্তিসূচক অভিব্যক্তি নিয়ে জবাব দিলেন, ভাল লাগে না, কিচ্ছু ভাল লাগে না। সংসারে আমার যেন কোন মূল্য নেই। সবার ভাবখানা এমন, যেন আমি গঙ্গার জলে ভেসে এসেছি। টাকা চাইব তাতে খিচ-খিচ, একটু দেরী করে বাড়ি ফিরব তাতে সন্দেহ। সন্দেহ যেখানে সেখানে নয়, একেবারে চরিত্রে। বিয়ে করে ভেবেছিলুম শালা সব কিছু ছেড়ে ঘরে থাকব, বৌটা আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে আর আমি সেই আমেজ নিয়ে লিখব, শুধু লিখব, কিন্তু বৌটাও শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ি চলে গেল। বাড়িতে মন বসছে না, তাই তো তোদের কাছে চলে এলুম—দশ হাজার টাকা চাই বুঝলি, এখুনি দশ হাজার টাকা চাই। নাঃ, তোদের কাছে এসব বলা মানেই অরণ্যে রোদন—

একজন উঠে এসে অমরেন্দ্রনাথের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, আহা, রোদন কোরো না ভাই, চল, দু'ঢোক খেয়ে শোধন করে আসি, যাবে নাকি হে?

অমরেন্দ্রনাথ বোকার মত বারকতক সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

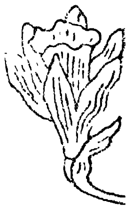
আর একজন পার্শ্বচর বলল, অমরেন্দ্র একটা কথা সার বুঝেছি, তা হল এই দুনিয়ায় কেউ কারও নয়, সব মিথ্যে বুঝেছ ?

কিন্তু না। সত্যি বলেও কিছু আছে। কি সত্যি, বল, বল, তোমরাই বল, কি সত্যি—

কথাটা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল আর এক বন্ধু।

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল, মাল, মদ—

অমরেন্দ্রনাথ আবার ভেসে গেলেন সেই কুসঙ্গের জোয়ারে।



অমরেন্দ্রনাথ সেদিন নিতান্ত অপরাধীর মতই নিজের বাড়ী ফিরছিলেন। একটা গোটা মানুষ ঠিক এই মুহূর্তে যেন একেবারে শূন্য, রিক্ত, হাল্কা। এক অদৃশ্য শক্তির বলে নেশায় নেশায় অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছিলেন তিনি।

অনেক রাত। সবাই ঘুমিয়ে। শুধুমাত্র গিরিধারীর চোখে ঘুম ছিল না। অমরেন্দ্রনাথের জন্য অধীর আগ্রহে সে প্রতীক্ষা করছিল। অমরেন্দ্রনাথ ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

পিছনে গিরিধারী। অমরেন্দ্রনাথ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আয়নার বুকে গিরিধারীর ছবি দেখে চমকে উঠলেন। আয়নার দিকে তাকিয়েই জড়ানো স্বরে বললেন, ওঃ গিরিধারী দাদা! এখনও জেগে আছ ?

গিরিধারী বলল, আবার তুমি কি সব ছাইপাশ গিলে এয়েছ বল

দিকিনি। ছোট বৌদিদিমণি যেই ক'দিন নেই, অমনি তুমি আবার আগের মত হয়ে গেলে ?

অমরেন্দ্রনাথ এবার ধমক নিয়ে বললেন, আঃ! গিরিধারী দাদা, এসব ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে এস না বলে দিলুম। দাদাদের পদানত হয়ে থাকব, আবার তুমিও উপদেশ দেবে, তোমরা ভেবেছ কি বলতো ?

গিরিধারী জবাব দিল, রাগ কোরো না, মেজাজটা একটু খাটো কর, এখন তোমার মেজাজ খাটো করে রাখা দরকার। তা ছাড়া এই সব ছাইপাঁশ তুমি ছেড়ে দাও ছোট দাদাবাবু, তুমি বাবা হয়েছ, এখনও যদি এসব তুমি না ছাড় তাহলে তোমার ছেলে বড় হলে এই সবই তো শিখবে—

এবার অমরেন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি উত্তেজিত হলেন। টেবিলের উপরে সজোরে একটা ঘুসি বসিয়ে বললেন, আঃ গিরিধারী দাদা, চুপ কর! তোমার সাহস বেড়েছে—চাকর চাকরের মত থাকবে, ফের যদি উপদেশ দাও তো আমি তোমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব বাড়ি থেকে-

গিরিধারীও এবার উত্তেজিত। আত্মসম্মানে আঘাত দিলে কে না উত্তেজিত হয়! সেই উত্তেজনা নিয়ে ভেজা গলায় বলল, তা দেবে বৈকি, তুমি আমায় ঘাড় ধরে বার করে না দিলে আর কে দেবে! আজ তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর এয়েছে তোমার ছেলে হয়েছে। এত বড় আনন্দের খবর তোমাকে দেব বলে এত রাত অবধি ঠায় বসে আছি, তোমার ছেলে বড় হলে যাতে তার বাবার এই খারাপ দিকটা জানতে না পারে তার জন্য তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই অপরাধে শেষ পর্যন্ত তুমি কিনা বললে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবে—কথা বলতে বলতে গিরিধারী চোখ মুছল। তারপর একটা দীর্ঘ শুকনো নিশ্বাস ফেলে বলল, বেশ, তোমার যা ভাল মনে হয় কর—

ব্যথিত গিরিধারী আর কথা না বাড়িয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অমরেন্দ্রনাথ ভিতরে ভিতরে একটা চাপা অস্থিরতায় ছটফট করতে থাকলেন।

অমরেন্দ্রনাথ বারবার হেমনলিনীর কথা ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারছিলেন না। সব কিছু মনে করবার চেষ্টা করছিলেন বটে কিন্তু এই মুহূর্তে যেন তাঁর মনটারই কোন অস্তিত্ব ছিল না।

নিজের অসহায় অবস্থায় নিজের প্রতিই করুণা করতে ইচ্ছে হল। আপন মনেই হো হো করে হেসে উঠলেন অমরেন্দ্রনাথ।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে কঠিন হয়ে উঠল মুখখানা।

তিনি যেন আবার স্পষ্ট শুনতে পেলেন, গিরিধারী বলছে, তুমি বাবা হয়েছ, এখনও যদি এসব না ছাড়, তাহলে তোমার ছেলে বড় হয়ে তো এই সবই শিখবে—

অমরেন্দ্রনাথের মুখের চেহারাটা একটু একটু করে পালটে গেল। কঠিন থেকে কঠিনতর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হতে থাকল। রাতের আকাশে তখন ভোরের আলো। আবার সহজ হলেন অমরেন্দ্রনাথ। নিজেকে সহজ করে নিয়ে সোজা চলে গেলেন শ্বশুরবাড়িতে। নবজাতককে হু'চোখ ভরে দেখলেন।

নিজেই ছেলের নাম রাখলেন 'নসীরাম'। গিরিশ ঘোষের নাটকের নামে নাম রেখে ভিতরকার থিয়েটারী মনটাকে একবার ঝালিয়ে নিলেন। হেমনলিনী বলল, তোমার কাছে একটা কথা বড় জেনে নিতে ইচ্ছে করছে।

অমর বললেন, আমি জানি তুমি কি জানতে চাও হেম, তুমি জানতে চাইছ আমাদের ছেলের নাম কেন নসীরাম রাখলুম, তাই না? জানো হেম, ছেলেবেলায় একদিন দাদা-বৌঠানদের সংগে হাতিবাগানের ষ্টারে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। গিরিশ ঘোষের নসীরাম। ঐ নসীরাম তারপর থেকেই আমাকে পাগল করেছিল, ঐ

নসীরাম আমাকে ঘর ছাড়া করেছিল। এই পর্যন্ত বলে অমরেন্দ্রনাথ থামলেন।

হেমনলিনী এবার অনেকটা সহজ হয়ে বললেন, খোকার ভাল নাম কি হয়েছে জানো?

অমরেন্দ্রনাথ মাথা নাড়লেন। জানেন না তাই বোঝা গেল।

হেমনলিনী বলল, সত্যেন। সত্যেন্দ্রনাথ।

এরপর থেকে অমরেন্দ্রনাথ আবার ঘরে মন বসালেন। বন্ধু-বান্ধব আড্ডা-নেশা সবকিছু থেকেই আবার নিজেকে সরিয়ে আনলেন অমর। আবার কলম ধরলেন। আবার লিখলেন একটা গীতিনাট্য। নাম রাখলেন 'মানকুঞ্জ'।

সবাইকে শোনালেন মানকুঞ্জ। সমবয়সীরা বন্ধুর প্রতিভায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। আনন্দে খুশিতে ভরে গেল সবাই।

কে একজন বলে উঠল, তুই এক কাজ কর অমর, এই নাটক কোন থিয়েটারে নিয়ে যা, গিরিশ ঘোষের কাছে গিয়ে একবার শুনিয়ে আয় না—

একটা পুরনো ক্ষততে কেউ খোঁচা দিলে যেমন হয় তেমনি অমর দত্তের থিয়েটারের নেশায় আবার খোঁচা পড়ল। ঠিক তার পর থেকেই অমরেন্দ্রনাথ দুরন্ত হয়ে উঠলেন থিয়েটার গড়ার নেশায়।

ঝড় যেমন কিছু মানে না, মানতে চায় না, ভয় করে না কাউকে, অমরেন্দ্রনাথও তেমনি দুর্বার হয়ে উঠলেন। একমাত্র প্রতিজ্ঞা থিয়েটার গড়ার। ভাবনা, থিয়েটার গড়তে হলে থিয়েটারের ভিতরকার চেহারাটা জানা দরকার, থিয়েটারের মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই ভাবনাকে সার্থক করে তুলবার জন্য একদিন অমর দত্ত সোজা হাজির হলেন এক থিয়েটারে।

ভিতরে যাবার চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ চেষ্টা। দারোয়ান সেই দুরন্ত গতিকে রোধ করে দিল। অমর অনেক বোঝালেন, অনুনয় করলেন, ভিক্ষা চাইলেন ভিতরে যাবার। রাজী হল না দারোয়ান। এই দৃশ্য

দেখে এগিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। অমরকে তিনি জানতেন, তাই যতটা সম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, কী ব্যাপার অমরবাবু, আপনি থিয়েটারের ভিতরে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করতে চান ?

অমর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন একটি নাম। যার অভিনয় দেখে অমরবাবু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন একদিন। নির্ভীকভাবে বললেন, আমি ঐ মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চাই, ঘনিষ্ঠ হতে চাই, সে যা চাইবে আমি তাই দেব, যদি থিয়েটার গড়তে চায় আমি থিয়েটার গড়ব ওকে পাশে নিয়েই—

সব কথা শুনে ভদ্রলোক কিন্তু বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলেন না। কোন ভাবনার রেখাই ফুটে উঠল না তাঁর চোখে মুখে। হাসতে হাসতে বললেন, তাই হবে, আমি নিজে আপনার সঙ্গে তার আলাপ শুধু নয় যাতে সে আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সেই ব্যবস্থা করে দেব, আসুন—

তাই হয়েছিল। এরপর কোন এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে একটি নটীজীবন এক অসাধারণ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

অনেকদিন পর বাড়ি ফিরলেন অমরেন্দ্রনাথ। অত্যন্ত সহজ একটা নতুন মানুষ যেন তিনি। সবার চেনা দুরন্ত ছুটে চলা সেই অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই মানুষটির এতটুকুও মিল নেই কোথাও। বাড়িতে ঢুকেই বেশ উৎফুল্লভাবে চিৎকার করে ডাকলেন, মা—মাগো—

অনেক দিন পর অহেতুক বাড়িছাড়া ছেলেটা আবার ফিরেছে শুনে রক্ষাকালী যেন আনন্দে খুশিতে দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

উচ্ছৃঙ্খল ছেলের জন্য একটা ক্ষোভ একটা অভিমান জমা হয়ে ছিল রক্ষাকালীর মনে, কিন্তু ছেলের মা ডাকে সব ভুলে গিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রক্ষাকালী।

নিতান্ত ছেলেমানুষের মত মাকে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন অমর। অভিমানের কান্নায় রক্ষাকালীর দুটো চোখ জলে ভরে গেল। অমর মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, আজ আমাকে দেখে তুমি অবাক হয়ে গেছ, তাই না মা ?

রক্ষাকালী বললেন, আমার রাধাগোবিন্দ তোকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এতে অবাক হব কেন ?

অমরেন্দ্র আব্দার করে বললেন, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে মা, কতদিন তোমার হাতে খাইনি, আজ লুচি খাব—

রক্ষাকালীর ভিতরটা কেঁপে উঠল। বুঝলেন, এ তো শুধু খেতে চাওয়া নয়, এ এক অনাহারী মানুষের আকুতি! ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন হিসেব করলেন তিনি। অনেকগুলো প্রশ্ন তাঁর মনে, এমন দশা হল কেন অমরের ? সে তো টাকার পর টাকা নিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, তবে এমন অনাহারে ক্ষীণ দেহ হল কেমন করে ? সেই হিসেবই বোধকরি মেলাবার চেষ্টা করলেন রক্ষাকালী। নিজেকে সহজ করে বললেন, তুই বিশ্রাম কর, আমি তোর খাবার নিয়ে আসি—

রক্ষাকালী চলে গেলেন। অমরেন্দ্রনাথ এবার নিতান্ত অপরাধীর মত নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। অনেকদিন ছেলেকে দেখা হয়নি। কেমন আছে, কোথায় আছে তাঁর একমাত্র নসীরাম সেই সব ভাবতে ভাবতে যখন নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালেন, তখন ঠিক সামনে বিছানার ওপরে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে সেই নসীরাম। অমরেন্দ্রনাথের একমাত্র ছেলে। কাছে এসে দু'চোখ ভরে দেখলেন তাকে। ঘুমন্ত ছেলেকে বুকের মধ্যে নিয়ে আদর করলেন।

এমন সময় হেমনলিনী এসে প্রণাম করে বলল, আর তুমি

চলে যাবে না তো? আমার একলা থাকতে যে ভয় করে, কষ্ট হয়—

অমরেন্দ্রনাথ এবার আস্তে করে হেমনলিনীর মুখখানা তুললেন। অবাক হলেন। ছল ছল দু'চোখ। অমর বললেন, যেতে আমাকে হবেই হেম, অনেক কাজের মধ্যে যে আমি জড়িয়ে গেছি—

হেমনলিনী বলল, ভাসুরঠাকুর বলছিলেন অনেকদিন তুমি অফিসে যাওনি, বাড়িতেও আস না, কি কাজ যে—

কথা শেষ হল না হেমনলিনীর। খাবারের থালা হাতে নিয়ে রক্ষাকালী ঘরে আসতেই হেমনলিনী আবার সেই একাকীত্বের ব্যথা নিয়ে সরে দাঁড়াল। রক্ষাকালী খাবারের থালা ছোট বৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হেমনলিনী আবার বলল, আমার একটা কথা রাখবে?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, বল—

হেমনলিনী বলল, সারাদিন তো কাজ কর, রাতের কাজগুলো কমিয়ে দিলে কি খুব ক্ষতি হবে? শরীরের দিকে তোমার নজর দেওয়া দরকার।

হেমনলিনীর এ কথার জবাবে অমরেন্দ্রনাথ বললেন, হেম, তুমি আমাকে ভয় কর?

হেমনলিনী জবাব দিল, শ্রদ্ধা করি।

অমরেন্দ্রনাথ আবার বললেন, আমাকে তুমি ভালবাস?

হেমনলিনী এবার স্বামীর মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে বললেন, আঃ, কেউ শুনে ফেলবে যে। এসব কথা কেন বলছ?

অমরেন্দ্রনাথ হেমনলিনীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এবারও তাঁর চোখে মুখে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। হেমনলিনীর চোখে ধরা পড়ার ভয়ে নিজেকে দ্রুত সামলে বললেন, এই যে আমি রাতের পর রাত বাড়ি ফিরি না তাতে তোমার রাগ হয় না?

হেমনলিনীর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া কি উচিত? রাগ হবে কেন, ভাবনা হয়—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আমার কাছে তোমার কিছু চাইবার নেই?

হেমনলিনী বলল, না চাইতেই তো সব পেয়েছি—

অমরেন্দ্রনাথ এবার আরও বেশী চঞ্চল হয়ে পড়লেন। বললেন, এই বাড়ি, এ বাড়ির সবাইকে তোমার ভাল লাগে?

হেমনলিনী স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিশ্চিন্তে জবাব দেয়, হ্যাঁ—

অমরেন্দ্রনাথের মুখখানা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর স্বরে বললেন, কিন্তু আমার কিছুই ভাল লাগে না। বিষয়-আশয়-টাকা-কড়ি নিয়ে বড়দার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার যে মনোমালিন্য হয় তাও আমার ভাল লাগে না হেম, এ সংসার আমার জন্যে নয়, তাই আজ তোমার কাছে যা চাইব দেবে? দিতে পারবে তুমি?

হেমনলিনী নিতান্ত সরল সোজা। হাসিমুখে বলল, আমার যা আছে সবই তো তোমার, আমার নিজের বলতে এমন কি আছে যা তোমাকে দিতে পারি?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, তুমি যখন মায়ের পাশে বসে রাধাগোবিন্দের পূজা কর তখন মাটির সেই প্রতিমাকে তো দেবতা বলেই জানো, বিশ্বাস কর। কিন্তু হেম, কেউ যদি বার বার তোমার কানে ঢেলে দেয় যে যাকে পুজো করছ তার প্রাণ নেই, নিছক মাটির পুতুল—তখনও কি তুমি সেই মাটির পুতুলকে দেবতা জ্ঞানেই পুজো করতে পারবে? তোমার বিশ্বাস ভেঙে যাবে না?

নির্ভয়ে জবাব দিল হেমনলিনী, না, একবার যার পুজো করব তাকে দেবতা জ্ঞানেই করব, শত বাধাতেও সেই বিশ্বাস মুছে যাবার নয়—

হঠাৎ অমরেন্দ্রনাথ বিছানার ওপরে সোজা হয়ে বসে হেমনলিনীর

হাতখানা চেপে ধরে অনুনয়ের স্বরে বললেন, সেই বিশ্বাস নিয়েই এ বাড়ি থেকে তুমি চলে যাও হেম—

চমকে উঠল হেমনলিনী। মুহূর্তে ওর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, এ তুমি কি বলছ! আমি তোমার কোন কথাই বুঝতে পারছি না।

অমরেন্দ্রনাথ নীরব।

হেমনলিনী আবার প্রশ্ন করল, কেন, আমি কি কোন অন্যায় করেছি? দয়া করে আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিও না—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, না হেম, কোন অন্যায় তুমি করনি, তবুও তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি চলে যাও, মনে কর এ তোমার দেবতার নির্দেশ—

হেমনলিনী বললে, ভাসুরঠাকুর সেদিন আমাকে নিয়ে এলেন, আর আজ মাত্র এই ক'দিনের মধ্যে আমি কেমন করে চলে যাব?

অমরেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, তুমি বলবে যে তুমি অসুস্থ, তাই কিছুদিনের জন্য তুমি যেতে চাইছ—

হেমনলিনী এবার কেঁদে ফেলল। ভেজা ভেজা স্বরে বলল, বেশ, তাই হবে! কিন্তু আমাকে তুমি আবার তোমার কাছে ফিরিয়ে আনবে তো? আমাকে চিরদিনের মত ভাসিয়ে দেবে না তো?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, ছিঃ ও কথা বলতে নেই হেম। এখন আমার অনেক কাজ, তা ছাড়া দাদাদের অপমানের জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি জানি একটা অশুভ ঘটনা ঘটতে চলেছে, তাই তো আমি তোমাকে সরিয়ে দিতে চাই।

হেমনলিনী বলল, বেশ, তাই হবে। আমি কালই চলে যাব।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, কিন্তু কথা দাও, তুমি এ-কথা কোথাও প্রকাশ করবে না—

হেমনলিনী বলল, আমি কথা দিলাম।

বাগানবাড়ির প্রশস্ত হলঘরের ঝাড়লণ্ঠনের আলোর নীচে আবার অমরেন্দ্রনাথের আসর বসল। এবার পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলল নাটকের মহলা। পার্শ্বচরদের নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ শুরু করে দিলেন অভিযান। কোন ভাবনা নেই, কোন চিন্তা নেই, যেন মুক্ত পুরুষ অমরেন্দ্রনাথ।

'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের মহলা চলছিল সেদিন।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, নিতান্ত শিশু অবস্থায় যা আমাকে ভর করেছিল, জ্ঞান হবার পর থেকে মনের যে বাসনাকে আমি চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, যে স্বপ্ন আমাকে গ্রাস করেছিল এই মুহূর্তে তার বাস্তব রূপ আমি দেখতে পাচ্ছি। আজ আমার আনন্দের দিন, আজ আমার খুশির দিন। আমি থিয়েটার করব, আমি থিয়েটার গড়ব, তোমরা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে কথা দাও—

সকলে একবাক্যে উত্তর দিলেন, কথা দিলাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অমরেন্দ্রনাথ।

তারপর থেকেই বাগমারীর বাগানে থিয়েটারের মহলা চলছিল পূর্ণোদ্যমে। নিরস মহলা নয়। মহলার ফাঁকে ফাঁকে আসরে আসছিল দামী দামী মদ আর খাবার। ইংরেজী খানা, ইংরেজী মদ।

অমরেন্দ্রনাথের খরচে কার্পণ্য নেই। জলতরঙ্গের মত টাকা উড়িয়ে অমরেন্দ্রনাথ মনের বাসনাকে সার্থক করে তুলবার জন্য রীতিমত মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন।

হঠাৎ একদিন অস্বাভাবিক অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। অর্থভাণ্ডার শূন্য। টাকা চাই। অনেক টাকা। টাকার জন্য অমর উন্মাদপ্রায়। অবশেষে চেনা-জানা মহল থেকে অতি গোপনে টাকা ধার করতে লাগলেন তিনি। একের পর এক হ্যাণ্ডনোট কাটতে এতটুকুও ভাবনা হল না। ধার করে যে টাকা পান তাতে শুধুমাত্র মহলা চলাকালীন খরচটাই কোনমতে চলে কিন্তু থিয়েটারের জন্যে কিছু সঞ্চয় করা যায় না। সুতরাং শুধু ধার করা টাকায় চলবে না বলে অমরেন্দ্রনাথ আরও টাকার চিন্তায় পাগল হয়ে গেলেন।

অমর জানতেন বন্ধুদের সন্তুষ্টির মধ্যে না রাখতে পারলে সমস্ত পরিকল্পনাই মাটি হয়ে যাবে। মদ আর ইংরেজী খানা দিয়ে সবাইকে ধরে রাখতে পারলে থিয়েটার গড়া সহজ হবে সেই কথা ভেবেই অমরেন্দ্রনাথ আরও অনেক টাকার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন।

তা ছাড়া থিয়েটারের যে নটী একটা বিরাট বিশ্বাস নিয়ে তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যে তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে সর্বদা পাশে পাশে থাকছে, সেই নটীও একটা থিয়েটার গড়ার ব্যাপারে যে অনেকখানি সাহায্য করবে সে বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথের কোন সন্দেহ ছিল না। থিয়েটার গড়ার স্বার্থে অমরেন্দ্রনাথ হ্যাণ্ডনোটের বিনিময়ে টাকার পর টাকা ঋণ করলেন। অর্থ ঢেলে থিয়েটারকে ভালবাসতে শেখালেন বন্ধুদের। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে ভালবাসলেন সেই নটীকে বহু মূল্যবান 'মণিহার' গলায় পরিয়ে দিয়ে। ধার করা 'মণিহার' নটীর গলায় যখন পরিয়ে দিলেন তখনও অমরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি সেই মণিহারের জৌলুষ, তার চকমকির আলো তাঁকে বিদ্রূপ করছে!

পার্শ্বচরেরা মন্ত্র দিয়েছিল, আমরা বলতে চাইছি, তুমি তো আর হাভাতে ঘরের ছেলে নও, বিষয়-সম্পত্তি যা তোমাদের আছে তাতে তোমারও তো অধিকার আছে। তাই বলছিলাম টাকা ধার না করে বাড়িতে তোমার ন্যায্য পাওনা দাবী কর, তাতে টাকা অনেক

বেশী পাবে, কাজ হবে। তা না হলে শুধু রিহার্সালই হবে, থিয়েটার আর হবে না, পরিশ্রম বৃথা যাবে—

বন্ধুদের পরামর্শে অমরেন্দ্রনাথের যেন দৃষ্টি খুলে গেল। সেই মুহূর্তে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন।

সমস্ত দাবী নিয়ে নিজের অধিকার রাখতে মনটাকে শক্ত করলেন অমরেন্দ্রনাথ।

তারা দরজা খুলে দিল। থিয়েটারের এক নামজাদা নটী তারাসুন্দরী যখন দরজা খুলে দিল ঠিক তখনই তার দু'চোখের মণি একরাশ বিস্ময় নিয়ে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

এত রাতে অমরেন্দ্রনাথকে দেখে তারাসুন্দরী যেন মূক হয়ে গেছে। অভ্যর্থনা জানাবার ভাষাটুকুও তখন ভুলে গেছে সে।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, এত রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করলাম, কিছু মনে কোরো না—

তারাসুন্দরীর যেন ঘোর কাটল। অত্যন্ত খুশি খুশি অভিব্যক্তি নিয়ে বলল, আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন এটা কি কম সৌভাগ্য আমার?

তারপর সসম্মানে অমরেন্দ্রনাথকে ঘরে নিয়ে গেল তারাসুন্দরী। অমরেন্দ্রনাথের হাতে ছিল সৌরভ পত্রিকার একটা সংখ্যা। পত্রিকাটি তারার সামনে রেখে অত্যন্ত আনন্দ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে বললেন, জিতেছি, আমি আজ জিতেছি তারা, বিনোদিনী আর তোমার লেখা আমার সৌরভকে আজ যে কী মর্যাদা এনে দিয়েছে তা ঠিক তোমাকে

বোঝাতে পারব না। জানো তারা, যারা আজকের সমাজের শিরোমণি তাদের মনের ভিতরে যে অপরাধের ক্ষত আছে সেই ক্ষততে তোমরা এমন খোঁচা দিয়েছ যার জ্বালায় ছটফট করতে করতে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে। পাগলা কুকুরের মতো ছটফট করছে। আমি আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছি তারা, শুধু কথা দাও এই মুহূর্তে তোমরা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে—

অমরেন্দ্রনাথের কোন কথাই তারাসুন্দরীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল না। সেই একই অভিব্যক্তি নিয়ে বলল, আমি একজন অতি নগণ্য মেয়েমানুষ, নটী, আপনার কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আমার কাগজে গিরিশ ঘোষের কথায় তোমরা কলম ধরেছ। কবিতা লিখেছ। সমাজ শিরোমণিদের আসল চেহারাটা তোমরা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করে দিয়েছ বলেই সেই অপমানের জ্বালায় ওরা আমার কাছে ছুটে এসেছিল। আমি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি, অপমান করেছি। ওরা আমাকে হুমকি দিয়েছে, ভবিষ্যতে যদি তোমাদের মত অশিক্ষিত সমাজচ্যুত বাজারে মেয়ে-মানুষ দিয়ে কবিতা প্রবন্ধ লেখাই তবে নাকি 'সৌরভ' বন্ধ করে দেবে। তারা, আমার অনুরোধ তোমরা আবার লেখ, আবার তোমরা তোমাদের কলম দিয়ে, যাঁদের জন্য তোমরা আজ সর্বহারা, সমাজচ্যুতা, কলঙ্কিতা তাদের আসল চেহারাগুলো নিংড়ে বার করে দিয়ে আমাকে একটা সুযোগ দাও তারা। তোমাদের যে মুখ আজ মুখোশ-পরা সমাজের চাপে মূক হয়ে গেছে, সেই মুখে ভাষা দেব আমি—সেই সুযোগ আমাকে দেবে কথা দাও; আমি তোমাদের সাহায্য পেলে থিয়েটার গড়তে পারব, সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারব—

তারাসুন্দরী অবাক হয়ে দেখছিল অমরেন্দ্রনাথকে। তারপর নিজেকে শক্ত করে দৃঢ়স্বরে বলল, কথা দিলাম আমি আবার আপনার সৌরভে লিখব, আপনি যেমন করে চালাবেন আমি তেমনি করে চলব—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অমরেন্দ্রনাথ। তারা বলল, এখনি চলে যাবেন ? আর একটু বিশ্রাম নিয়ে গেলে খুশি হতাম, আপনি আজ বিচলিত—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, দশ হাজার টাকা কয়েকটা মাসে কর্পূরের মত উড়ে গেল, বাজারে ঋণ হয়ে গেল। রিহার্সালের চেহারাটাও কেমন যেন ম্লান, সবাই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে, সৌরভও বোধহয় আর চালানো যাবে না—আমি হেরে যাচ্ছি, বার বার হেরে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি—

তারাসুন্দরী এবার একটু ভয়, একটু সংশয় নিয়ে বলল, আমার ছোট মুখে বড় কথা মানায় না, তবুও আপনি যদি অভয় দেন একটা কথা বলতে পারি—

অমরেন্দ্রনাথ তারাসুন্দরীর এতটা বিনয় দেখে একটু ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, তারা, বিনয় নয়, প্রকৃত বন্ধুর মুখে বিনয় সাজে না, বল তুমি কি বলতে চাও—

তারাসুন্দরী বলল, আমি জানি সৌরভ পত্রিকাকে আপনি সন্তানের মত ভালবাসেন, সৌরভের মাধ্যমে আপনি আজকের সমাজের সবচেয়ে বড় জায়গায় আঘাত করে ওদের ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। জানি, এখন আর ওখান থেকে ফিরে আসা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি আপনার স্বপ্ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, ফিরে আসুন, আপনি সব ছেড়ে থিয়েটার গড়ার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করুন। সমস্ত জীবন পণ করে যদি আপনি লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন শত বাধা আপনাকে হারাতে পারবে না, আপনি থিয়েটার গড়ুন—

কথা বলতে বলতে তারাসুন্দরী ভীষণ ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ল। অমর দত্তের মনের ওপরে তখন ভোরের আলোর প্রথম স্পর্শ।

ধীরেন্দ্রনাথ ভারাক্রান্ত মনে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, মা, এত রাত অবধি তুমি যদি রোজ জেগে থাক, যদি 'কালু' 'কালু' করে নিজের মনটাকে এমন করে কষ্ট দাও তাহলে যে তোমার শরীর ভেঙে পড়বে মা। তুমি এ ক'দিনে যে কতটা ভেঙে গিয়েছ তা কি জানো?

রক্ষাকালী বললেন, আমি যে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না বাবা। নিমাইবাবু এসেছিলেন, শুনলাম কালু নাকি নিমাইবাবুর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করবে, আমার যে বড় ভয় করছে ধীরু। আমি বলি কি, হাজার হোক সে তোমার ছোট, তা ছাড়া কালু যত উচ্ছৃঙ্খল হোক সে তোমার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করবে না, তুমি বরং কালুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আন—

ধীরেন্দ্রনাথ ভারী স্বরে জবাব দিলেন, মা, আমি কেন, স্বয়ং তুমি গেলেও সে আর ফিরবে না। মানে একটা কথা তোমাকে বলা দরকার, আর তা না-বলতে পারলে আমিও স্বস্তি পাচ্ছি না মা। কথা দাও, আমার সব কথা শুনে তুমি ব্যথা পাবে না।

রক্ষাকালী একটু বেশী মাত্রায় চঞ্চল হয়ে পড়লেন। একটু উতলা স্বরে বললেন, এমন করে বলছ কেন বাবা, অশুভ কোন খবর নয় তো? আমার কালু ভাল আছে তো? বল বল—

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, ভালই আছে। তবে তার রুক্ষ ব্যবহারে শুধু আমরাই যে আজ বাইরের জগতে ছোট হয়ে গেছি তাই নয়, সে আমাদের এই দত্ত বংশের মান-মর্যাদাও ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে মা—

সে শুধু নিমাইবাবুকে অপমান করেছে তা নয়। আমার কয়েকজন বন্ধুকে এবং আজকের সমাজের যাঁরা মাথা এমন কয়েকজনকেও রীতিমত অপমান করে বাগানবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার ওপর বাজারের একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে সে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতাই করছে তাই নয়, কয়েকজন মেয়েমানুষকে দিয়ে সৌরভে কবিতা লিখিয়েছে। স্বরলিপি নামে গল্প লিখিয়েছে, উদ্দেশ্য এই সব বাজারের মেয়েমানুষদের কবি বানিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। না মা, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। কালুর সব অন্যায় সহ্য করতে পারি তাই বলে এই পাগলামী আমি কখনই বরদাস্ত করব না।

রক্ষাকালী বললেন, কালু তোমাদের মত বিচক্ষণ নয় জানি, কিন্তু কবিতা লেখার অধিকার একমাত্র গণ্যমান্যদের থাকবে এ কেমন ধারা বিচার বাবা? যারা গৃহস্থ মেয়েমানুষ তারা কবিতা লিখলে তাতে তোমরা দোষ খুঁজে পেতে না, যেহেতু কালু বাজারের মেয়েমানুষ আর কয়েকজন নটীকে দিয়ে কবিতা লিখিয়েছে সেই হেতু তোমাদের এই ক্ষোভ, তাই না? কিন্তু বাবা, এর মধ্যে কালুর ভাল দিকটা কি তোমরা কেউ আবিষ্কার করতে পারলে না?

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, এ তুমি কি বলছ মা! এ ব্যাপারটাকে তুমি অন্যায় বলে স্বীকার করতে পারছ না কেন মা? থাক এ সব কথা, আরও শুনবে তোমার গুণধর ছেলের কীর্তি? টাকা ধার করে সে আজ নিজেকে পর্যন্ত বিক্রী করতে বসেছে। অফিসে যাওয়া বন্ধ করেছে। একটা সম্পত্তি সে দু'বার মর্টগেজ দিয়ে টাকা নিয়েছে, চারিদিকে তোমার কালুর এই কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছে। শুনছি কাল কয়েকজন টাকা আদায় করার জন্য আইনের চিঠি দিয়েছে। এমন কি একজন তোমার ছেলের নামে ওয়ারেণ্ট বার করেছে। আগামী কাল যদি তোমার কালু সুদ সমেত সেই টাকা শোধ করতে না পারে তাহলে পুলিশ তাকে কোমরে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

রক্ষাকালী যেন চমকে উঠলেন। যে ছেলেকে তিনি একটু বেশীমাত্রায় স্নেহ করেন তার এই পরিণতির কথা ভেবে যেন শিউরে উঠলেন তিনি। অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, এ তুমি কি শোনালে বাবা! এ আমার কী সর্বনাশ হল! এর একটা প্রতিকার কর বাবা, ওর যদি কিছু হয় আমি যে প্রাণে বাঁচব না।

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, মা, তুমি ধৈর্য ধর। তুমি যদি এ ভাবে অস্থির হও তাহলে আমরা যে ভীষণ বিব্রত বোধ করব। আসলে কালু যে সর্বনাশের জাল বিছিয়েছে তাতে সে নিজেকেই জড়িয়ে ফেলছে তা তো তুমিও বুঝতে পেরেছ মা, একটা বড় রকমের শাস্তি ওর পাওয়া দরকার আর তাহলেই ওর শোধরাবার সম্ভাবনা আছে। এই মুহূর্তে কালুকে বাঁচাতে হলে পঁচিশ হাজার টাকা দরকার, কিন্তু আমাদের ঘরে নগদ পঁচিশ টাকাও বোধ করি নেই। কিছুদিন আগে নগদ দশ হাজার টাকা তাকে দিয়েছিলাম, সুতরাং কালুকে বাঁচাবার জন্য এই টাকা দেওয়া একদিনের মধ্যে সম্পত্তি বিক্রী করেও সম্ভব হবে না, কাজেই—

রক্ষাকালী দাঁড়াতে পারছিলেন না। তাঁর দেহটা দুলছিল। আর এক মুহূর্তের জন্যও অপেক্ষা না করে রক্ষাকালী একরকম ছুটে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সোজা এলেন ঠাকুরঘরে। আছড়ে পড়লেন রাধাগোবিন্দর পায়ের ওপর। আকুল উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেললেন তিনি।

ঠিক সেই সময়ে অসহায় অমরেন্দ্রনাথ এলেন একটি বাড়ির দরজায়।

দরজায় বারকতক টোকা দিতেই কে যেন একজন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেলল। ঘর থেকে প্রশ্ন করল, কাকে চাই?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, সতীশ আছে? ওকে একবার বাইরে আসতে বল, বল অমরেন্দ্রনাথ এসেছে দেখা করতে।

বন্ধু সতীশ দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার? হঠাৎ আমার বাড়িতে?

অসহায় অমরেন্দ্রনাথ বললেন, ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি ভাই, জরুরী দরকার, যদি একটু সময় দাও তো বলি—

সতীশ বিনয়ের সুরে বলল, আজ আমার বিন্দুমাত্র সময় হবে না, আমি বরং কাল পরশু তোমার কাছে যাব— বলে মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দিল।

এমনি করে সেই রাত্রিতে অমরেন্দ্রনাথ উল্কার মত ছুটে বেড়ালেন বন্ধু আর পার্শ্বচরদের দরজায় দরজায়। কিন্তু কেউ অমরেন্দ্রনাথের কোন কথাই শুনল না।

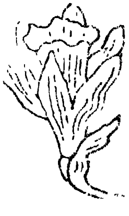
কেউ সময় নেই, কেউ অসুস্থ, কেউ অসন্তুষ্টির অভিব্যক্তি দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করল অমরেন্দ্রনাথকে। ব্যর্থ অমরেন্দ্রনাথ অবশেষে ফিরে এলেন বাগানবাড়িতে।

যে জলসা ঘরে অমরেন্দ্রনাথের আসর বসে, যে আসরে এই সব পার্শ্বচরেরা শোভা-বর্ধন করে বসে থাকে, যে আসরে ইংরেজী খানা আর মদের ফোয়ারা ছোটে, যে আসরে নটী তাঁর কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকে, সেই আসরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

শূন্য আসর। যেন ভাঙা হাট। এক মহা শূন্যতা।

একরাশ ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ বসে পড়লেন চেয়ারে।

ওঁর দু' চোখের পাতা ভিজে এল।



হেমনলিনী একরাশ চাপা ব্যথা নিয়ে আপন মনে বসে ছিল। একটা কিছু ভাবছিল সে। মনের ভিতরকার ঝড় আর বাইরের

কালবৈশাখীর ঝড় ছুয়ে মিলে যেন একাকার হয়ে গেল। হেমনলিনীর এলো চুলগুলো ঝড়ে ছটফট করছিল।

বৃষ্টি পড়ল। হেমনলিনীর দু'চোখ দিয়েও সেই মুহূর্তে জল গড়িয়ে পড়ল।

অনেকগুলো দিন চলে গেছে। স্বামীকে না দেখার ব্যথায় হেমনলিনী আজ যেন একটু বেশীমাত্রায় কাতর হয়ে পড়েছে। হেমনলিনী এবার ভারাক্রান্ত মনে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াল। ওখান থেকে রাস্তাটা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হেম।

পাশে এসে সান্ত্বনার সুরে পরিচারিকা বলল, এই ভাবে সব সময় পথের দিকে চেয়ে থেকে চোখের জল ফেললে শরীরটা তোমার ভেঙে যাবে। একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছ নিজেকে, এ ক'দিনের মধ্যে শরীরটার কি হাল হয়েছে তোমার? কত করে বললুম, বাড়িতে সব খুলে বল, তাতে তুমি রাজী নও। কিন্তু নীরবে চোখের জল ফেলে যদি আসল ঘটনাটাকে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ, কেউ যদি জানতে পারে জামাইবাবু তোমাকে এখানে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাহলে তোমার হাল কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? আমি বলি কি, সব কথাই খুলে বল, যদি তুমি বলতে না পারো আমাকে আদেশ কর আমি বলি।

হেমনলিনী বলল, না রে, তা হয় না, স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাঁকে না জানিয়ে যদি ও-বাড়িতে যাই, তাতে বাড়ির সবাই খুশি হবেন ঠিকই কিন্তু তিনি যদি খুশি না হন? আমার ব্যবহারে উনি যদি কষ্ট পান তাহলে যে পাপ হবে! তিনি যা-ই করুন, তাঁর নামে যত আজেবাজে খবরই আমার কানে আসুক তবু জানি তিনি আমাকে ভুলে থাকেন না। কাজের চাপে আসতে পারেন না, তার মানে তো এই নয় যে তিনি আমাকে আর তাঁর ছেলেকে ভুলে গেছেন। দেখিস, আমার মন বলছে তিনি আসবেন। এবার এসে আমাকে তিনি সঙ্গে করেই নিয়ে যাবেন—

পরিচারিকা বলল, আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আমি না বুঝে তোমাকে যদি কোন আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। রাত অনেক হয়েছে, তার ওপরে আকাশ ফুটো হয়ে সেই যে জল নেমেছে, ঝড় উঠেছে তারও বিরাম নেই। আমি বলি কি, ক'দিন ধরে মুখে কিছু তুলছ না, আজ কিছু খেয়ে নেবে চল।

হেমনলিনী কাঁদো কাঁদো স্বরে জবাব দিল, আমার যে মুখে আর খাবার উঠতে চাইছে না রে, যতবার ভাবি খাব, ততবারই যে তাঁর মুখখানা আমি দেখতে পাই। কতদিন হল উনি খেতে বসলে পাশে বসে পাখার বাতাস করিনি, পেট পুরে না খেয়ে উঠে গেলে, আমি এখানে বসে জানতেও পারি না। আমি কোনদিন পেট পুরে না খাইয়ে ছাড়িনি। এখন হয়তো তেমনি করে ঝগড়া-ঝাটি, মন কষাকষি করে তিনি খাবারের থালা রেখে উঠে যান। কিন্তু কেউ তাঁকে বাধা দেয় না, আমি কেমন করে খাই বল দিকিনি?

পরিচারিকা হেমনলিনীর স্বভাব ভাল করেই জানে। সর্বদাই তার পাশে থেকে চোখে চোখে রাখে। একটা অলিখিত কর্তৃত্ব তাকে ঠিক অন্য সাধারণ পরিচারিকার মত দূরে সরিয়ে রাখেনি। তাই জোর করেই সে বলল, তা বলে এই ভাবে তোমাকে থাকতে দেব না। তোমার ছেলের জন্য তোমাকে শক্ত হতে হবে, আমার মরা মুখ দেখবে আজ যদি তুমি না খাও—

হেমনলিনী বলল, আমাকে তুই এতটুকুও শান্তি দিস না কেন বলতো?

পরিচারিকা হেসে জবাব দিল, আমি মরলে তবেই তোমার শান্তি। নাও, খেয়ে শুয়ে পড়বে চল—

হেমনলিনী নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়েই ভিতরে চলে গেল।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব তখন সমানে চলছে। বিরামহীন বৃষ্টিতে গোটা কলকাতাটা তখন কুকুর ভেজা। বজ্রের ভয়ঙ্কর শব্দে বাড়িগুলো মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠাণ্ডা বাতাস। হেমনলিনী ছেলেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। একটা ভয়, একটা অস্বস্তি, একটা তপ্ত অনুভূতি নিয়ে মানসিক দুর্বলতায় তালগোল পাকানো হেমনলিনী বড় অসহায় অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হেমনলিনীর শোবার ঘরের পিছন দিককার ঘোরানো লোহার সিঁড়িটা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এই মুহূর্তে বড় বেশী রকমের ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যেন হাড় বার করা জীর্ণ শীর্ণ অস্তিত্ব।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে, সেই অবিশ্বাস্য দুর্যোগ মাথায় নিয়ে নিতান্ত চোরের মতো অতি সন্তর্পণে একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে এল। তারপর হেমনলিনীর শোবার ঘরের পিছন দিককার সেই দরজার কাছে উঠে এসে বার কতক আস্তে অথচ ব্যস্ততার সঙ্গে ঠুক ঠুক করে আওয়াজ করল সেই ছায়ামূর্তি।

হেমনলিনী আওয়াজ শুনে যন্ত্রচালিতের মতো উঠে বসল বিছানার ওপরে। একটা বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলা। আবার সেই শব্দ!

হেমনলিনী সাহসে ভর করে এবার উঠে এল দরজার কাছে। দরজা খুলে বিস্ময়ের আতিশয্যে চমকে উঠল। ওর মুখে ভাষা ফোটার আগেই ইশারায় কথা বলতে বারণ করে আগন্তুক একরকম জোর করে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। ঘরের আলোয় অমরেন্দ্রনাথের

চেহারাটা স্পষ্ট হল। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। ভিজে পাঞ্জাবী আর ধুতি যেন তাঁর সর্বাঙ্গে আঠার মতো সেঁটে গেছে। মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত। হেমনলিনী অবাক হয়ে স্বামীকে দেখল। অনেকদিন পর স্বামীকে কাছে পেয়ে হেমনলিনী কাঁদবে না হাসবে ভাবতে পারছিল না। একরাশ খুশিতে ওর দু'চোখে জল টলটল করে উঠল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, উঃ কতদিন পর এলে বলতো ? আমি জানতাম তুমি আসবে, জানো, আমি আর কিছুতেই এখানে এমন ভাবে একলা থাকতে পারছি না। আমার ভেতরটা ছটফট করছিল, কিন্তু আজ, আজ বার বারই মনে হয়েছে তুমি আসবে—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, হেম, একটা শুকনো কাপড় দিতে পারো, আমি সেই সন্ধে থেকেই ভিজছি—তারপর একটু থেমে অমরেন্দ্রনাথ আবার বললেন, এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে নিতান্ত চোরের মতো লুকিয়ে পিছন দিককার সিঁড়ি দিয়ে তোমার কাছে কেন এলাম জানতে চাইলে না তো ?

হেমনলিনী বলল, তুমি এসেছ সেটাই তো আমার কাছে বড়, কোথা থেকে, কেমন করে, কি কারণে তা আমার জানার দরকার কি ?

অমরেন্দ্রনাথ বলল, জানো হেম, আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ছি। বিশ্বাস কর হেম, আমি যেন জীবনের সব দিক থেকে হেরে যাচ্ছি। বাড়িতে কারও সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলতে গেলে সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। আমি একটা কিছু গড়তে চাইছি, অথচ যা গড়তে চাই সবই ভেঙে যাচ্ছে, সবই হারিয়ে যাচ্ছে, আর আমি দিন দিন সকলের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছি। একরাশ ব্যর্থতার জ্বালা আমাকে গ্রাস করছে। তুমিও কি আমাকে ঘৃণা কর হেম ?

হেমনলিনী বলল, ছিঃ ছিঃ, ও সব কথা কানে শোনাও পাপ, তুমি এমন করে বোলো না গো—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, কিন্তু সবাই আমাকে ঘৃণা করে, সবাই ভাবে আমি উচ্ছৃঙ্খল, আমি চরিত্রহীন—

হেমনলিনী বলল, সবাই তোমাকে যা-ই বলুক, আমি তো জানি, তোমার ভিতরকার মানুষটা একটা আসল মানুষ, সেই মানুষটাকে ওরা কেউ চিনতে পারেনি, চেনবার চেষ্টাও করেনি—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, তুমি এমন করে আমাকে ভালবাস! সত্যিই অবাক লাগে হেম—

হেমনলিনী বলল, মেয়েদের এমন করেই ভালবাসতে হয় যে।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, তাই আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মরা হল না।

হেমনলিনী বিস্ময়ভরে বলল, কী বলছ তুমি! কেন এসব কথা বলে তুমি আমাকে আঘাত দিচ্ছ?

কাপড় বদলে অমরেন্দ্রনাথ বললেন, বড় ক্ষিধে পেয়েছে—

হেমনলিনীর বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। একটু বেশী মাত্রায় চঞ্চল হয়ে পড়ল হেমনলিনী।

অধীর অভিব্যক্তি নিয়ে বলল, খাবে, নিশ্চয়ই খাবে, তুমি বোসো, আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি—বলে হেমনলিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমরেন্দ্রনাথ এবার নিজের ছেলের কাছে এগিয়ে গেলেন। ওর ঘুমন্ত মুখের কাছে মুখ নামিয়ে কি যেন দেখবার চেষ্টা করলেন। যতবার ছেলের মুখখানা ভাল করে দেখতে চান ততবারই তিনি যেন অদৃশ্য কোন শক্তির আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়েন। পারেন না।

হেমনলিনী এত গভীর রাতে অতি সন্তর্পণে স্বামীর জন্যে খাবার আনতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল। শূন্য ভাঁড়ার। অবশেষে সামান্য কিছু খাবার সংগ্রহ করে যখন ফিরে এল তখন অমরেন্দ্রনাথ আরাম-কেদারায় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

হেমনলিনী খাবারের থালা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল স্বামীকে। তারপর অতি ধীরে নিঃশব্দে থালা নামিয়ে রেখে বেশ কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটা শুকনো নিঃশ্বাস ফেলল।

অমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ জেগে গেলেন সোজা হয়ে বসলেন বললেন, আমাকে তুমি ডাকলেই পারতে।

হেমনলিনী সে কথার জবাব দিতে পারল না তার চোখ থেকে নীরবে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, তুমি কাঁদছ হেম ?

হেমনলিনী বলল, তোমার এই চেহারা, আমি যে আর দেখতে পারিনে। কেন তুমি আমাকে তোমার সেবা থেকে বঞ্চিত কর ?

অমরেন্দ্রনাথ হাসলেন। ম্লান হাসি। বললেন, খাবার এনেছ ?

হেমনলিনী খাবারের থালা এগিয়ে দিল। অমরেন্দ্রনাথ একটা খাবার মুখে দিয়ে ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, হেম, জানি না আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তাই আজ এমন চোরের মতো একবার তোমাকে দেখে গেলাম—

হেমনলিনী বলল, কেন তুমি আমাকে কাঁদাতে এলে! কেন এসব অমঙ্গলে কথা শুনিয়ে তুমি আমাকে কাঁদাতে চাও ? বল, বল কি হয়েছে তোমার ?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, সব কথা শুনে স্বয়ং দাদারাও আমার সম্বন্ধে উদাসীন থেকে গেলেন। মা-ও একবার আমার দিকে করুণার দৃষ্টি মেলে তাকালেন না। আর তুমি, তুমি আমার জন্য কতটুকু কি করতে পারো!

হেমনলিনী বলল, আমি সাধারণ মেয়ে, আমার যতটুকু মূল্য তা তো তোমার মূল্য দিয়েই যাচাই হবে। আমি তো কিছুই করতে পারি না, আমার কি আলাদা কোন ক্ষমতা আছে গো ?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, রাতের অন্ধকারে যেমন চোরের মত এসেছি, তেমনি এই অন্ধকারেই আমাকে গা ঢাকা দিতে হবে, কেন জানো ?

হেমললিনী বলল, না—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আমার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। অর্থের

তাগিদে, সৌরভকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, একটা থিয়েটার গড়ার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় আমি ঋণগ্রস্ত। যারা হাসি মুখে আমাকে টাকা দিয়েছিল, তারা আজ অসময়ের সুযোগ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। দিনের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে যদি টাকা শোধ করতে না পারি, তাহলে আদালতে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। আমি আর কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তাই আলো ফুটবার আগে আমাকে পালিয়ে যেতে হবে, যে আত্ম-গোপনতাকে আমি সব চাইতে বেশী ঘৃণা করতাম সেই আত্মগোপনই করতে হবে আমাকে—

হেমনলিনী এবার দপ করে জ্বলে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদ করে বলে উঠল, না—! আমি তা হতে দেব না, আমি কিছুতেই তোমাকে হারতে দেব না—

কথা শেষ করে হেমনলিনী একে একে গা থেকে সব গয়না খুলে দিল। এমন কি গয়নার যে অংশ আলমারীতে তোলা ছিল তাও সে বিনা বাক্যব্যয়ে হাসিমুখেই স্বামীর হাতে তুলে দিল। বলল, যাও, আমি আর তোমাকে ধরে রাখব না। এগুলো বন্ধক দিলে কিংবা বিক্রি করে দিলে আপাতত সব দেনাই মেটাতে পারবে—

অমরেন্দ্রনাথ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন হেমনলিনীর দিকে।

হেমনলিনীর মুখে হাসি, চোখে জল।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, অমরেন্দ্রনাথ তাঁর ঋণ পরিশোধ করেছেন।

খবর পেয়ে আর যাঁরা অমরেন্দ্রনাথের কাছে টাকা পেতেন তাঁরাও একসঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে এগিয়ে এলেন টাকা আদায়

করতে। একের পর এক আদালতের সীল করা নোটিশও এসে হাজির হতে থাকল। প্রত্যেকেই অমরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য আদালতের আশ্রয় নিল। অমরেন্দ্রনাথ অস্থির হয়ে পড়লেন। সব বিপদ সব অপমান যেন চারিদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল। অমরেন্দ্রনাথের অবস্থা এমন হল যেন চারিদিকে মৃত্যুবাণ আর মাঝখানে অসহায় তিনি পরিত্রাণের জন্য ছটফট করছেন।

খবরটা হাতীবাগানের বাড়িতেও পৌঁছে গেল।

বড়দা-মেজদা-মা-বৌদিরা সকলেই বিমর্ষ। এক অমরেন্দ্রনাথের জন্য দত্তবংশের ভরা নৌকোটা ডোবে ডোবে।

উপায় না দেখে অমরেন্দ্রনাথ আবার এসে দাঁড়ালেন দত্ত বাড়িতে।

মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মা নীরব। বৌদিরা নিতান্ত ঘৃণার সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মেজদা রুক্ষ। বড়দা ভারীস্বরে বললেন, আমি জানি তুমি কেন এসেছ। তোমাকে কিছু বলার নেই, তুমি নিজের হাতে নিজের কবর যখন খুঁড়েছ সেই কবরেই তোমাকে যেতে হবে। শুধু দুঃখ কি জানো, লোকচক্ষে তুমি আমাদের শুধু ছোটই করলে তা নয়, আমাদের বংশের মান-মর্যাদা সব কিছু তুমি লাথি মেরে ভেঙে চুরে তছনছ করলে,—বৌমাকে বিনা দোষে বাড়ি থেকে তাড়ালে, ভাবলে চোখের সামনে স্ত্রী-পুত্র থাকলে তোমার উচ্ছৃঙ্খলতায় ব্যাঘাত ঘটবে! বাঃ! এখনও সাবধান হও, এখনও তুমি তোমার পথ বেছে নাও, এখনও তুমি বাঁচ কাল—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, বাঁচতে আমি চাই বড়দা। আমার যা কিছু অন্যায় যা কিছু অপরাধ সব আমারই প্রাপ্য। বড়দা, একটা কথা, আমার ধৃষ্টতাকে মার্জনা করবেন। আমরা আর পাঁচজনের মতই জন্মেছি, কিন্তু সব জন্মই কি সার্থক? না, তা নয়, যেদিন মরব সেদিন সবাই যদি না জানতে পারে অমরেন্দ্রনাথ মরেছে তাহলে

কিসের জন্ম! তাই তো এমন একটা কিছু করতে চেয়েছিলাম, যা আমাকে চিরকালের মতো বাঁচিয়ে রাখবে। হাল আমি ছাড়িনি। ছাড়তে পারবও না, আমি একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই—

ধীরেন্দ্রনাথ সব কথা শুনলেন। বললেন, বেশ তাই হোক। শোনো, এখন যে ঘোরতর বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমার কাছে এসেছ, সেখান থেকে মুক্তি তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু কি করতে হবে জানো?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, জানি না। তবে ভয়ঙ্কর কিছু যদি শোনান আমি তাও মেনে নেব—

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, যা বলব, তা যদি মেনে নাও তবে পরে অনুশোচনা করবে না আশা করি।

অমরেন্দ্রনাথ হাসিমুখে জবাব দিলেন, না।

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, কাল থেকে যদি শুধ্ শূন্যতার মাঝখানে তোমাকে দাঁড়াতে হয়, তখন কিন্তু আমাদের দোষ দিও না—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, কাল থেকে কেন বড়দা, এই মুহূর্তে যদি আমি সর্বহারা হয়ে রাস্তায় দাঁড়াই তাতেও কোন ক্ষোভ থাকবে না।

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি জানতাম, আর জানতাম বলেই তোমার জন্য আমি নিজের হাতে সব কাজই শেষ করে রেখেছি— সই কর—

অমরেন্দ্রনাথ সই করতে উদ্যত হলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, একবার পড়ে দেখলে না, কিসের ওপরে সই করছ?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, তার প্রয়োজন বোধ করি না। একটা কথা তো আমি বুঝতে পারছি যে আমি আমার মুক্তির ছাড়পত্রে সই দিচ্ছি—

দ্রুত সই করলেন অমরেন্দ্রনাথ।

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, তোমার বিষয়-আশয় এমন কি এই বসত-

বাড়ি, বাগানবাড়ি তাছাড়া অন্যবাড়িগুলোতেও আর তোমার দাবী রইল না। কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার যা দেনা আছে তা আমরাই শোধ করব এবং তুমি পঁচিশ হাজার টাকা পাবে, এখন তুমি আসতে পারো—

অমরেন্দ্রনাথ শেষবারের মতো গোটা ঘরটা দেখলেন। দেখলেন বাবার ঠাকুরদার ছবি। আসবাব পত্তর। তারপর একটা শুকনো নিশ্বাস ফেললেন।

নিতান্ত অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বড়দার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

বাইরে এসেই চমকে উঠলেন অমরেন্দ্রনাথ। মা দাঁড়িয়ে।

মাকে দেখে অমরেন্দ্রনাথের ভিতরকার মানুষটা কেঁদে উঠল। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। মায়ের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সামর্থটুকুও ছিল না তাঁর। মাকে একটা প্রণাম করলেন। এই বোধহয় শেষ প্রণাম। তারপর একরকম ছুটেই বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। বাড়ির বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালেন অমর। পিছন ফিরে আর একবার অর্থাৎ শেষবারের মত বাড়ির সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। যে বাড়ির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক, যে বাড়ি তাঁর জন্মস্থান, যে বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট-কাঠ-পাথরের সঙ্গে জন্মের পর থেকেই মধুর আত্মীয়তা—এই মুহূর্তে সেই বাড়ির সঙ্গে চিরজন্মের মতো সব সম্পর্ক তুলে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে। একটা চাপা শুকনো নিঃশ্বাস যেন আপনা থেকেই অমরেন্দ্রনাথের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এবার দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগলেন তিনি।

এরপর নিজেদের বাগানবাড়ি ছেড়ে বাগমারীতে একটা বাগান-বাড়ি ভাড়া নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ উঠে গেলেন সেখানে। ছুটে চলা জীবন তবুও অপ্রতিহত রইল।

গিরিশ ঘোষ তখন গ্রীনরুমে মেক আপ তুলছিলেন। সরাসরি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন অমরেন্দ্রনাথ। বললেন, আমি আপনার কাছে না এসে পারলাম না।

গিরিশবাবু বললেন, আজ তোমাকে একটু বেশী আপসেট মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আপনি নিশ্চয়ই কিছু খবর রাখেন ?

গিরিশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, না রাখলেও আন্দাজ করতে পারছি। হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান হয় না, তেমনি সংসারের সব মানুষ সমান নয়, আর নয় বলেই যত দ্বন্দ্ব। যাক সে সব কথা, বল, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি। তোমার সৌরভ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা লোকে যাই বলুক, নিতান্ত ঝকমারী কিছু হয়নি। এ ব্যাপারে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। ভাবনা হয় তোমাকে নিয়ে, এই আন্দোলন করে কি পেলে বলতো ? কিছু না। বরং হাজার দশেক টাকা তোমার লোকসান হল।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, তাই তো আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি আমাকে সুযোগ দিন। আজ আমি নিতান্তই অসহায়, আমার প্রাচুর্য আর বিলাসের নৌকোটা আমি নিজে হাতে ডুবিয়ে দিয়েছি, আপনি সাহায্য না করলে আমার মৃত্যু ছাড়া আর পথ নেই, আমাকে অভিনয়ের সুযোগ দিন—

গিরিশ ঘোষ বললেন, এ তুমি কি শোনালে অমরেন্দ্র ? শেষ পর্যন্ত তুমি অভিনয় করবে ! থিয়েটার গড়বে না ?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি এখন কপর্দকশূন্য, থিয়েটার গড়ার মতো সামর্থ বা শক্তি কোনটাই নেই।

গিরিশ ঘোষ বললেন, কিন্তু তুমি কি অভিনেতা অভিনেত্রীদের মতো কষ্ট করতে পারবে? তুমি বাইরে থেকে থিয়েটারকে যে-চোখে দেখেছ, আসলে থিয়েটারের বাইরেটাকে দেখে ভিতরটাকে একদম চেনা যায় না,—জানো—জানো অমরেন্দ্রনাথ, থিয়েটার যারা করে তারা কি পায়? পায় লাঞ্ছনা অপমান। সমাজচ্যুত হয়, আত্মীয়-স্বজনের চোখে কুলাঙ্গার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়—প্রান্তর থেকে প্রান্তর, দেশ থেকে দেশান্তর, পাড়ি জমিয়ে রাতের পর রাত জেগে অর্ধাহারে অনাহারে থিয়েটার করতে হয়। পারবে? পারবে অমরেন্দ্রনাথ, এই আঁকা বাঁকা কাঁটা বিছোনো পথ ধরে ছুটে যেতে?

একরাশ ভাবনা নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ সেদিন ফিরে এলেন।

ভাবতে ভাবতে ক্রমেই অমরেন্দ্রনাথ অধীর হয়ে উঠলেন।

একটা চাপা অস্থিরতা নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন। তারাসুন্দরীর মন সেই সঙ্গে আরও বেশী বিচলিত হয়ে পড়ল।

তারা একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হল, আজ আপনি এত বিচলিত হলেন কেন? কি হয়েছে আপনার?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, তুমি থিয়েটার কর, না?

তারা বলল, হ্যাঁ,

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, থিয়েটারের মালিকরা তোমাদের ঠিক মতো মাইনে দেয়?

তারা বলল, হ্যাঁ—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না—

তারা বলল, আমরা সামান্য নটী বৈ আর কিছু তো নই, কাজেই সত্যি বলতে আমাদের অনেক বাধা—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, ভুল ভুল, সব ভুল! মিথ্যের জাল বুনলে

একদিন তোমরা এই মিথ্যের জালে নিজেদের এমন করে জড়িয়ে ফেলবে যখন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে এত ভয় কেন তোমাদের ?

তারা বলল, সত্যিই ভয়, দেওয়ালেরও কান আছে। থিয়েটারে অভিনয় করে যা পাই তাতে পেট চলে না, জীবন চলে না, এ কথা যদি থিয়েটারের মালিক শুনতে পান—তাহলে হয়তো কাজ থাকবে না, তাই—

আমি থিয়েটার খুলব—আমি থিয়েটার খুলব—বলে এক চরম অস্থিরতার সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন অমরেন্দ্রনাথ।

তারা সহজ করে বললেন, থিয়েটার খুলতে অনেক টাকা লাগে—

অমরেন্দ্রনাথ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চারপাশে অন্ধকার জেনেও অতীতের মন নিয়ে বলে উঠলেন, তোমরা কি আমাকে টাকার ভয় —কথাটা শেষ করার আগেই বর্তমানের নিজেকে চিনতে পেরে সামলে নিলেন। সহজ করে বললেন, জানি তারা, অনেক টাকার দরকার, আমার কাছে শেষ সম্বল কিছু আছে। করমচাঁদ জহুরীর দেড় হাজার টাকা শোধ হবার পরও আমার কাছে হাজার চারেক টাকা আছে; সব দিয়েও যদি এবার হেরে যাই, জানব আমার স্বপ্নের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তখন হাসতে হাসতে চলে যাব। যদি কোথাও স্থান না পাই গঙ্গার জল তো আছে, নিজেকে শেষ করে দেব গোপনে। চল তারা, আমরা আবার অভিযান শুরু করি—

আবার রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। আবার লাল শালুতেবড় বড় করে লেখা হল ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব। চলল অভিযান। অবশেষে একটা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করে অভিনয় করলেন অমর। স্বপ্নের প্রথম সোপানে এসে দাঁড়ালেন সদলবলে। থিয়েটারের জীবন যাযাবর জীবন। নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ না থাকলে আজ এই থিয়েটার কাল সেই থিয়েটার ভাড়া করে যাদের অভিনয় করতে হয় তারা যাযাবর ছাড়া আর কি! অমরেন্দ্রনাথ সেই যাযাবর জীবনের যন্ত্রণা নিয়েই ভাড়া করা রঙ্গমঞ্চে 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বেল্লিক বাজার' নাটক অভিনয় করে একটা ঝড় তুললেন।

ছুটে এলেন গিরিশবাবু। একটা বিরাট খুশি নিয়ে অমরেন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। সসম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অমর। গিরিশবাবু বললেন, অমর, আজ তোমার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছেন জানো?

অমরেন্দ্রনাথ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, জানি না কে এসেছেন, যিনিই আসুন, আমি ভাগ্যবান, চলুন আমি নিজে গিয়ে দেখা করে আসি—

গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে এলেন অমরেন্দ্রনাথ। সামনেই সৌম্য-দর্শন এক ভদ্রলোক। গিরিশবাবু বললেন, ইনি কবি নবীনচন্দ্র। যাঁর সৃষ্ট সিরাজের তুমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছ, সেই পলাশীর যুদ্ধের রচয়িতা তোমার সামনে—

প্রণাম করলেন অমরেন্দ্রনাথ। নবীনচন্দ্রের পদধূলি মাথায় তুলে নিয়ে বললেন, আজ আমি ধন্য।

অমরেন্দ্রনাথকে বুকে টেনে নিলেন কবি।

রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে সেদিন এক মহান মিলনের ছবি আঁকা হয়ে গেল।

যাযাবর জীবন থেকে মুক্তি চাই। নিজের মনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে অমর ছুটে গেলেন বন্ধু সতীশের কাছে। সতীশ চ্যাটার্জী। ধনাঢ্য গোপাললাল শীলের সঙ্গে সতীশ চাটুজ্জের অনেক দিনের জানাশোনা। সতীশকে গোপাল শীল ভালও বাসেন। এ সব অমরেন্দ্রনাথের কাছে অজানা ছিল না। তাই উপায়ান্তর না দেখে সেই সতীশ চাটুজ্জের কাছে ছুটে গেলেন অমর। সব কথা শুনে সতীশ বললেন, গোপাল শীলের কাছে তোমাকে নিয়ে গেলে যদি তোমার কোন উপকার হয়, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে এমারেল্ড থিয়েটারের মালিক গোপাল শীল তোমার কথায় যদি রাজী না হন আমায় কিন্তু দোষ দিও না বন্ধু।

অমর বললেন, তবুও চেষ্টা আমাকে চালাতেই হবে। মুক্তি আমার চাই। কিছু গড়তে না পারার যে যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি আমাকে নিতেই হবে। অবশেষে সেই মুক্তি কামনায় মরিয়া হয়ে ধনকুবের গোপাললাল শীলের কাছে ছুটে গেলেন সতীশকে সঙ্গে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ। গোপালবাবুর নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ এমারেল্ড থিয়েটার দীর্ঘ দিন মূক হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছিল। অমরেন্দ্রনাথ অনেক

আশা নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কাছে। কিন্তু সে সব কথায় কর্ণপাত করেননি ধনাঢ্য গোপাল শীল। অমরের বড়দার বন্ধু, সুতরাং কয়েকটা উপদেশ দিয়ে তিনি সেদিন নিজের প্রাসাদ থেকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিলেন অমরকে।

নিতান্ত মরা একটা মন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ।

বাগানবাড়িতে ফিরে এসে পার্শ্বচরদের কাছে সব কথা খুলে বলেছিলেন তিনি।

ওদের কাছ থেকে একটু সহানুভূতি আশা করেছিলেন কিন্তু উলটে এক বিপত্তি ঘটে গেল। বেঁকে বসল বন্ধুরা। আগে যেমন করে তারা অমরেন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছিল, যেমন করে তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখতে পারেনি আজও ঠিক তেমনি করে অমরেন্দ্রনাথকে ভুল বুঝে গেল ওরা।

বন্ধুদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত হয়েই বলে ফেলল, অমর, তুমি থিয়েটারের নামে আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ।

একটা লোহার শিক গরম করে একজন লোকের গায়ে জোর করে ঢুকিয়ে দিলে যেমন হয়, বন্ধুর কথাটাও ঠিক তেমনি করে অমরেন্দ্রনাথের ভিতরকার খাঁটি মানুষটাকে সুতীব্র খোঁচা দিয়ে যেন কাতর করে তুলল।

অমরেন্দ্রনাথের থিয়েটারের দলে যারা যুক্ত ছিল, মাঝে মাঝে অভিনয় করত তারা, সবাই যে তাঁর আশ্রিত সে কথা তিনি মনে না করলেও, তাদের খাওয়া-দাওয়া এমন কি সব রকম বিলাস সামগ্রীও মুখের সামনে সময় মত জুগিয়ে যাবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি কখনই। অর্থাভাবে ইদানীং সেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অমরেন্দ্রনাথের একটু সংযত হওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও তারা অপমান করতে দ্বিধা করল না। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যি সত্যিই এক মহাশূন্যতার মধ্যে অমরেন্দ্রনাথকে ফেলে দিয়ে ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাবের সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়ে তারা চলে গেল।

নিঃসঙ্গ নায়ক যেন একটু একটু করে এসে দাঁড়ালেন সর্বনাশা বিবরের মুখে।

দিশেহারা হয়ে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথ। থিয়েটারকে ভালবেসে যে মানুষটা সংসারের সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে যাদের হাত ধরে একান্ত একলা হয়ে থিয়েটার গড়ার আকাঙ্ক্ষায় জীবন মন সব কিছু বিনা বিচারে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন একটা জগৎ সবটুকু বিশ্বাস দিয়ে, সেই মানুষকে অহেতুক এমনি করে একলা হয়ে যেতে হল। অনেক ভাবলেন অমরেন্দ্রনাথ। ভাবলেন এরপর মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথেই যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন দরকার! একরাশ দুর্ভাবনার আবর্তে ঘুরতে লাগলেন তিনি। একরাশ অশান্তির পোকা যেন কুরে কুরে খেতে লাগল তাঁর মনটাকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল কপালে। ঠিক যে মুহূর্তে অমরেন্দ্রনাথ মৃত্যুকেই পরম মিত্র হিসেবে বরণ করে নিতে চাইলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই অযাচিত ভাবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন এমন একজন যাঁকে ধনাঢ্য গোপাললাল শীল কোনদিন কোন অবস্থাতেই বিমুখ করেন না। তিনি শ্যামমাধব। শ্যামমাধব রায়। গোপাল শীলের বন্ধু আবার যুবক অমরেন্দ্রনাথের তিনি পরম হিতৈষী। শ্যামমাধব যেন অমর দত্তের এই চরম মানসিক বিপর্যস্ত মুহূর্তে পরম পরিত্রাতা হিসেবে কাছে এসে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত শান্ত স্বরে বললেন, আমি সব জানি অমর—অমরেন্দ্রনাথের দু'চোখে বিস্ময়। নিজেকে সামলে

নিয়ে অমর বললেন, আপনি আমাকে সাহায্য করুন, এমারেল্ড থিয়েটার না পেলে আমি হেরে যাব, আমি শেষ হয়ে যাব। আমি জানি, গোপালবাবু আর পাঁচজনকে নিরাশ করলেও আপনাকে করতে পারবেন না, আপনি যদি আমার হয়ে ওঁকে বলেন তাহলে এমারেল্ড থিয়েটার আমার কাছে লীজ দিতে কোনই আপত্তি করবেন না গোপালবাবু—

শ্যামমাধব একটু হাসলেন। বললেন, চল, আমি তোমাকে নিয়ে গোপালের কাছে যাব, আর সেই কারণেই স্বইচ্ছায় আমি নিজে এসেছি—

শ্যামমাধব রায়ের কথা শুনে আনন্দে টলমল করে উঠলেন অমর। ভিতরকার আনন্দে অমর দত্তের দু'চোখে জল টলটল করে উঠল। তারপর অমরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামমাধব সোজা হাজির হলেন গোপালবাবুর কাছে। শেষ পর্যন্ত জিতলেন অমরেন্দ্রনাথ। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা এমারেল্ড থিয়েটার গোপাললাল শীলের কাছ থেকে লীজ নিলেন তিনি।

আনন্দে উদ্বেলিত হলেন অমরেন্দ্রনাথ। বার বার হারতে হারতে আবার জিতবার আনন্দে যেন নিতান্ত ছেলেমানুষের মত নেচে উঠলেন। অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা আর ভালবাসা নিয়ে শ্যামমাধব রায়ের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তিনি। শ্যামমাধবের অযাচিত সাহায্যে অমরেন্দ্রনাথ আজ পরিপূর্ণ। তারপর ওঁরা দুজনে এসে দাঁড়ালেন থিয়েটারের সামনে। হৃতশ্রী থিয়েটারের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে একটা শুকনো দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অমরেন্দ্রনাথ। ওঁর চোখে মুখে একটা ভাবনার রেখা ফুটে উঠল।

শ্যামমাধব বললেন, কি ভাবছ?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, ভাবছি অনেক কথা—

শ্যামমাধব এবার একটু হেসে বললেন, জানি তুমি কি ভাবছ, ভাবছ যে দেশে থিয়েটারের এত অভাব, যে দেশে একটা থিয়েটারের

অভাবে তোমাকে আত্মহত্যার পথ নিতে হয়েছিল, সেই দেশে এমন একটা থিয়েটার পড়ে আছে নিতান্ত অযত্নে, অবহেলায়। জানো ভাই, যার অগাধ থাকে তার কোথায় যেন একটা কিছু থাকে না, যার অর্থ থাকে তার সৃজনশক্তি থাকে না, যার সম্পদ থাকে তার সম্পদের প্রতি মর্যাদা জানাবার অবকাশ থাকে না—

অমরেন্দ্রনাথ কথাগুলি শুনছিলেন আর গোটা থিয়েটারের ভিতরের চেহারাটা দেখছিলেন। দেওয়ালে মাকড়শার জাল, ঘরের কোণে কোণে চামচিকের বাসা। আয়নাগুলো ক্যাকাশে বিবর্ণ, ধূলো জমেছে। চারিদিকে ভাঙা মদের বোতলের টুকরো আর জরি-চুমকী বসানো রাজপোশাকের ছেঁড়া অংশ ছড়ানো। একটা শিল্পীতীর্থ যেন শ্মশানের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। অমরেন্দ্রনাথের দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল।

এমারেল্ড থিয়েটার লীজ নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ মাত্র ক'দিনের মধ্যে সেই হতশ্রী থিয়েটারের আমূল সংস্কার করলেন। জরাজীর্ণ এমারেল্ডকে অপরূপ করে সাজালেন তিনি। রাজ মিস্ত্রি আর ছুতোর মিস্ত্রিদের সঙ্গে অফুরন্ত কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেন দেবী প্রতিমার পূর্ণ রূপ দান করলেন অমর দত্ত।

এবার এল প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগ্ন। অমরেন্দ্রনাথ এবার বেরিয়ে পড়লেন পথে।

যে বন্ধুরা একদিন কোনরকম আস্থা রাখতে না পেরে তাঁকে একলা রেখে চলে গিয়েছিল, তাদের কাছে আবার ছুটে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। ছুটে গেলেন দানী-চুনী আরও অনেকের দরজায়। আবার অনুনয়ের সুরে বললেন, তোমরা আবার আমার পাশে এসে দাঁড়াও ভাই। আমি কথা দিয়েছিলাম স্থায়ী থিয়েটার গড়ব, যাযাবরের মত থিয়েটার ভাড়া করে আর বেড়াব না, সেই কথা আমি রেখেছি ভাই।

তারপর সব কথাই ওদের খুলে বললেন অমরেন্দ্রনাথ। পুরোনো

বন্ধুদের মধ্যে অনেকে সাড়া দিল না বটে, আবার নতুন অনেকেই অমরেন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিলেন।

আবার ম্লান আসরে আলো ঝলমল করে উঠল। আবার শুরু হল নাটকের মহলা। অমরেন্দ্রনাথ ছুটে গেলেন গিরিশ ঘোষের কাছে। অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে, অনেক স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে যে স্বপ্নের সার্থক রূপ তিনি দিয়েছেন, তারই পূর্ণ দায়িত্ব গিরিশবাবুর হাতে তুলে দেবার আশা নিয়ে গিয়েছিলেন অমর। থিয়েটারের দায়িত্ব নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র সে অনুরোধ রাখলেন না। প্রত্যাখ্যান করলেন অমরেন্দ্রনাথকে। এই অপ্রত্যাশিত অপমানে ব্যথিত হলেন কিন্তু হতাশ হলেন না অমরেন্দ্রনাথ। বন্ধুদের নিয়ে অভিযান শুরু করে দিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারের সামনে নতুন করে টাঙানো হল একটা নতুন থিয়েটারের নাম—ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোং।

মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেল ঝকঝকে ছাপার অক্ষরে অমরেন্দ্রনাথের সেই কীর্তিকাহিনী। এক শুভদিনে শুভক্ষণে ক্লাসিক থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। 'নল দময়ন্তী' নাটকের নল-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন অমরেন্দ্রনাথ। সে অবিশ্বাস্য চরিত্র-সৃষ্টি। অভিনয় দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল হাজার হাজার দর্শক।

'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে মহাদেব চরিত্রে অভিনয় করে কয়েক রজনীর হাজার হাজার দর্শকের মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিলেন। অসাধারণ অভিনয়ে সিরাজ চরিত্র বাস্তব হয়ে দেখা দিল মঞ্চে। আসলে অল্প-দিনের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ যেন একটা ঝড় তুলে দিলেন। উল্কার মত ছুটতে থাকলেন তিনি। শুধু অভিনয় আর অভিনয়। হাততালি খ্যাতি প্রশংসা কুড়িয়ে নিতে নিতে ক্লান্তিহীন নায়ক ধেয়ে যেতে লাগলেন সামনের দিকে। অবসর নেই। ক্লান্তি নেই। শুধু একের পর এক নতুন নতুন নাটক উপহার দিতে থাকলেন অমরেন্দ্রনাথ।

যারা একদিন অমরেন্দ্রনাথকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিত, যারা ঘৃণায় দরজা বন্ধ করে দিত তাঁর মুখের ওপর, তারা ছুটে এল উপঢৌকন হাতে করে।

স্তম্ভিত হলেন গিরিশচন্দ্রও। অমরেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল কাগজের পৃষ্ঠায়।

তবুও অমর দত্ত অস্থির।

সেদিন ঠিক তেমনি অস্থিরভাবে সারা ঘরময় পায়চারী করছিলেন তিনি। ছটফট করছিলেন। এমন সময় সেই ঘরে এল পরিচিত একটি লোক। বলল, একটা খবর শুনেছেন?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, আর শুনেছি বলে নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারছি না। 'বিল্বমঙ্গল' দেখে সবাই মুগ্ধ অভিভূত অথচ টিকিট বিক্রি নামমাত্র, তাই তো শোনাবে তুমি?

আগন্তুক বলল, না ঠিক তা নয়, তবে আপনি যা বললেন তা বড় ভাবনার। যে নাটকের এত প্রশংসা সেই নাটকের টিকিট বিক্রি শূন্য, এর মানেটা কি বলুন তো?

এবার অমরেন্দ্রনাথ আরও গম্ভীর হলেন। বললেন, আমাদের দেশের দর্শকদের বোঝা দায়, তারা যে কখন কি পেলে সন্তুষ্ট হবে তা আজও বুঝতে পারলাম না। তা হোক, তবুও আমার বিচলিত হওয়া উচিৎ নয়—

আগন্তুক অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে, আমিও তাই বলতে চাই, জানেন, 'কপালকুণ্ডলা'র সংস্কৃত অনুবাদক পণ্ডিত হরিচরণ কাব্যতীর্থ কি বলেছেন? শুনুন, আপনাকে পড়ে শোনাই। আগন্তুক বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে পড়তে লাগলেন।—বিল্বমঙ্গল নাটকে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনয় অবিস্মরণীয়। মনে হচ্ছে আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহ সংক্ষীয়তে জীবনম্—এই মহা উপদেশ জনসমক্ষে প্রচার করার জন্যই অমরেন্দ্রনাথের মত এমন একটি মানুষ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন—

মুহূর্তে অমরেন্দ্রনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, বন্ধ কর, বন্ধ কর ও ভাষণ, ওটা শোনাও পাপ, ওর ভিতরে আমার ধ্বংসের বীজ পোঁতা, তুমি বুঝতে পারছ না। আত্মপ্রশংসা শোনা বা করা দুটোই খুনের চাইতেও অপরাধ। ছিঁড়ে ফেল ও প্রলাপ—কথাটা শেষ করার আগেই নিজেই সেই কাগজটা টেনে তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, এখন আমার আত্মপ্রশংসা শোনার সময় নয়—সবাইকে খবর দাও আজ থেকেই নতুন নাটকের রিহার্সাল শুরু করব আমি। দেবী চৌধুরাণী। হ্যাঁ, আমার আগামী নাটক 'দেবী চৌধুরাণী।'

মাথা নত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আগন্তুক। সে বেরিয়ে যাবার পর অমরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই তালগোল পাকানো কাগজের ওপর। কাছে এগিয়ে গেলেন। সসম্মানে সেই কাগজের দলাটা হাতে তুলে নিলেন। মাথায় তুলে নিয়ে প্রণাম করলেন; চুমু খেলেন। তারপর নিজেকে আর সামলে রাখতে না পেরে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললেন অমরেন্দ্রনাথ।

অস্থির অমরেন্দ্রনাথ। একের পর এক নাটকে অভিনয় করে অভিনেতা হিসেবে অমর সবার মন জয় করলেও, কোন নাটকেই পয়সা পাওয়া যায়নি আর সেই যন্ত্রণায় ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে করতে, সারা ঘরময় পায়চারী করতে করতে এক সময় অমরেন্দ্রনাথ এসে বসলেন একটা আসনে।

ক্লান্তিতে অমর যেন ভেঙ্গে পড়ছিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত অমরেন্দ্রনাথ

একরাশ চুলের মধ্যে আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

হঠাৎ যেন অমরেন্দ্রনাথ কেমন চঞ্চল হয়ে পড়লেন। সোজা হয়ে বসলেন তিনি। এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ টেনে নিলেন একখানা বই। মোটা ঝকঝকে একখানা বই সেটা। দেবী চৌধুরাণী। কয়েকটা পাতা পর পর চোখের সামনে উল্টে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। তারপর দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখতে শুরু করলেন তিনি। আরম্ভ করলেন দেবী চৌধুরাণীর নাট্যরূপ।

একটু একটু করে লেখার মধ্যে ডুবে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। সময় মত খাওয়া দাওয়া এমন কি ঘুমোনো সব কিছু কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

যখন রাত হয়, যখন রাত গভীর হয়, যখন গোটা দেশের প্রত্যেকটা মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, যখন দু'একটা কুকুর ছাড়া আর কেউ জেগে থাকে না, তখন অমরেন্দ্রনাথ লিখে যান।

ঠিক সেদিনও সেই লেখার মধ্যে ডুবে ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। এমন সময় দরজার পর্দা সরিয়ে একান্ত আপনজনের মত কাছে এসে দাঁড়াল তারা। তারাসুন্দরী।

থিয়েটারের নটী তারা। একটা তাজা মেয়ে।

একদিন এই তারা তার রূপের সোনার কাঠিটি কখন যে তাজা যুবক অমরের মনের ওপর বুলিয়ে দিয়েছিল তা তারা আর অমর ঠিক না জানলেও কোন এক মুহূর্তে ওদের দুটো মন পরস্পর মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

থিয়েটার দেখতে এসে তারার রূপ আর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন অমর।

তারপর ধনীর দুলাল অমরেন্দ্রনাথের ছুটে চলা জীবনের সঙ্গে তারা জড়িয়ে পড়ছিল অতি সহজে।

এ সব নিয়ে রটনার সীমা ছিল না।

গোটা দত্ত বাড়ীটা একদিন অমরের এই জীবন, একদিন নটীর সঙ্গে এই অবৈধ সম্পর্কের খবরে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। মা রক্ষাকালী তো নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বাগানবাড়ীতে ছেলের কাছে একটা চরম চিঠিই পাঠিয়ে বসেছিলেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন অমর। মা লিখেছিলেন, "বাড়ীতে সুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়া বাগানবাড়ীতে একটি বাঁদর মাগী লইয়া আছ—"

বার বার ঐ একই জায়গায় চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে অমর হেসে উঠেছিলেন আপন মনে।

হেমনলিনীর কানেও স্বামীর অপকীর্তির কাহিনী বার বার পৌঁছে দেওয়া সত্ত্বেও হেমনলিনী কোথায় যেন নিজের ভিতরটাকে শক্ত করে রেখেছিল। যারা হেমনলিনীর কাছে এসে দু'বেলা তার স্বামী নিন্দায় পঞ্চমুখ হতো, একদিন তাদের মুখের ওপর হেমনলিনী বলেই ফেলেছিল, দোহাই আপনাদের—আমার কাছে ওঁর নিন্দে করবেন না, আমি যে সইতে পারিনে।

তারপর নিজেকে সহজ করে বলেছিল, যে কাজে আমার স্বামী নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন সেই কাজের জন্য আমার স্বামী যদি কোন নটীকে সংগিনী করেই থাকেন আমি তো তাতে দোষ দেখি না।

হেমনলিনীর কথায় নিন্দুকের মুখে ছাই পড়েছিল।

সেই নটী তারা। যে তারাকে নিয়ে এত রটনা এত ঘটনা সেই তারা সেদিন রাতে নীরবে অমর দত্তের পাশে এসে দাঁড়াল। শান্ত-নম্র স্বরে বলল, অমর বাবু, আজ ক'দিন রাতের পর রাত জেগে, সময় মত খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে আপনি লেখা নিয়ে আছেন। আমি বলি কি এভাবে শরীরটা মাটি করলে আপনি যে কাজ করার ক্ষমতা হারাবেন।

তারপর একান্ত আপনজনের মত অমরের হাত থেকে কলম টেনে নিয়ে তারা আবার অনুনয়ের সুরে বলল, চলুন, একটু বিশ্রাম নেবেন চলুন।

অমর দত্ত যেন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেলেন। অবাক বিস্ময়ে তারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অমর দত্ত যেন মনে মনে এই নটীর ভিতরকার দেবী রূপটাকে দু'চোখ ভরে দেখলেন।

বললেন, জানো তারা, থিয়েটার করার জন্য আমি থিয়েটার গড়তে চাইনি কখনো। থিয়েটার গড়ে আমি এমন কিছু দেখাতে চাই যা আরও পাঁচজনের কাছে যেন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। আর তা সম্ভব হবে টাকা পেলে। থিয়েটারের টাকায় থিয়েটারের ভিতরকার সব গ্লানি আমাকে মুছে ফেলতে হবে। এতদিন নাটক করলুম কিন্তু পয়সার মুখ দেখতে পেলুম না, শুধু লোকসান। আমি এই দেবী চৌধুরাণী নাটক মঞ্চস্থ করে টাকা পেতে চাই। লেখা প্রায় শেষ, আর সামান্য বাকি। মনে হয় আজ তোমাদের সবাইকে এই নতুন নাটক শোনাতে পারব। তারাসুন্দরীর মুখে আর ভাষা ফোটে না।

অমর দত্তের কথা শেষ হতেই তারা কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার মুখে ভাষা ফোটার আগেই অমর দত্তের ঘরে এসে দাঁড়ালেন ধর্মদাস। থিয়েটার জগতে তখন নামকরা দৃশ্যসজ্জাকার ধর্মদাস সুর।

ধর্মদাসকে দেখে অমর দত্তের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের ওপরে যেন এক মুঠো খুশীর আবির ছড়িয়ে গেল। অমর দত্ত বললেন, জানেন ধর্মদাস বাবু, থিয়েটার দেখে একদল মানুষ খুশী হলো, আবার একদল মানুষ থিয়েটার না দেখেই দু'চারটে গুণগান গেয়ে কর্তব্য শেষ করল।

কিন্তু আমি তো এ চাইনি। আমি চেয়েছিলাম, প্রত্যেকটি লোক স্বতস্ফূর্তভাবে থিয়েটার দেখবে, ভাল-মন্দ বিচার করবে, এতে থিয়েটার পাবে পয়সা, আমাদের যদি ত্রুটি থাকে কোথাও আমরা পাব তা শুধরে নেবার সুযোগ,—কিন্তু তা হলো না।

ধর্মদাস বললেন, আপনি তো নতুন অনেক কিছুই দিলেন এই ক'টা দিনের মধ্যে। ঠেলা সিন—কাটা সিন—উইংস ইত্যাদির আমূল

সংস্কার করলেন, কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা তার অর্থই বুঝতে পারল না—

এবার অমর দত্ত যেন হঠাৎ একটু উত্তেজিত হলেন। বললেন, দেবে দেবে—ওরা থিয়েটার দেখে পয়সা দেবে। ম্যাজিকের খেলা দেখালে, চমক সৃষ্টি করলে ওদের পকেটের পয়সা আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে। আর সেই ম্যাজিকই আমি দেখাতে চাই। নাটককে কোথাও ক্ষুণ্ণ না করে নাটকের চাহিদা মত যদি চমক এনে দিতে পারি, তা হলে থিয়েটার থেকে পয়সা আমাদের আসবেই—আর সেই জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম ধর্মদাসবাবু—

ধর্মদাস বললেন, বলুন আমাকে কি করতে হবে—

অমর দত্ত বললেন, দেবী চৌধুরাণী নাটকে আমি মঞ্চের ওপরে চলমান বজরা দেখাতে চাই। সুসজ্জিত বজরায় যখন ব্রজেশ্বর আর প্রফুল্ল সংলাপের মধ্যে ডুবে যাবে, একদল ডাকাত অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে বজরা। দু'দলে সংঘর্ষ বাধবে। গর্জে উঠবে বন্দুক। দর্শকরা দেখবেন বন্দুকের নল থেকে আগুন বেরুচ্ছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে গল গল করে—, আপনি এসবের আয়োজন করুন, টাকা লাগে পাবেন—

এতটুকুও দ্বিধা না করে অমরবাবুর পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য কথা দিলেন ধর্মদাস সুর।

এক বুক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্বামীর খ্যাতির খবর হেমনলিনীর কানে পৌঁছেছিল। সেদিন কিন্তু হেমনলিনী আনন্দে মুখর হতে পারেনি। আনন্দ আর খুশীর ভাষা

জানা ছিল না তার। শুধু দুটো চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল।

বেশ কিছুদিন যাবৎ হেমনলিনী শয্যাশায়ী। সময় মত না খাওয়া, রাতের পর রাত পথের দিকে চেয়ে চেয়ে রাত কাটানো, মানসিক অস্থিরতা—সব মিলিয়ে হেমনলিনীর ভিতরটা ক্ষয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে শয্যাশায়ী। বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল হেমনলিনীর দেহ। ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন হেমনলিনী একলা ঘরে বালিশের ভিতরে মুখ গুঁজে কাঁদছিল। এমনি করে রোজই কাঁদে সে। এমন সময় বালক বিজয়েন্দ্রনাথ একটা হ্যাণ্ডবিল হাতে করে আনন্দের আতিশয্যে লাফাতে লাফাতে এসে দাঁড়াল বৌদির পাশে।

বিজয়েন্দ্রনাথ এ বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে। অমরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই। বৌদির শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে খুশী খুশীভাবে বলল, বৌঠান, আজ একটা আনন্দের খবর আছে—

ক্ষীণস্বরে হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করল, কি খবর ভাই?

বিজয়েন্দ্রনাথ দাদাদের ভয় করে। এ বাড়িতে অমরেন্দ্রনাথের কোন কথা বা তার সম্বন্ধে সব কিছুর প্রবেশ নিষেধ তাও বালক বিজয় জানত বলে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে হ্যাণ্ডবিলটা মেলে ধরল অসুস্থ হেমনলিনীর চোখের সামনে। হ্যাণ্ডবিলে শুধু থিয়েটারের খবরই নয় সেই সঙ্গে ছাপা আছে অমরেন্দ্রনাথের ছবি। হেমনলিনী মুহূর্তে যেন সতেজ হয়ে উঠল।

নিজের অসুস্থতা ভুলে গিয়ে একরাশ খুশীর আনন্দে বিছানা থেকে অবচেতন মনে নেমে এল। হ্যাণ্ডবিলে ছাপা স্বামীর ছবিটার ভিতরে যেন জীবন্ত অমরেন্দ্রনাথকে দেখতে পেল সে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে হেমনলিনী সেই ছবিটা আদরে আদরে ভরিয়ে তুলতে তুলতে এক সময়ে কেঁদে ফেলল। তারপর দুর্বল দেহটা তার টলে উঠে আছড়ে পড়ে গেল বিছানার ওপরে। জ্ঞান হারাল হেমনলিনী।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে বালক বিজয়েন্দ্রনাথ কেমন যেন মূক হয়ে গেল। একটা অকথিত যন্ত্রণা নিয়ে হেমনলিনীর দেহটা পড়ে রইল সেই বিছানার ওপরে। পরক্ষণে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে।

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বালক বিজয়েন্দ্রনাথ বাড়ি থেকে পালিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। যেমন করেই হোক দাদার কাছে বৌদির অসুস্থতার খবর পৌঁছে দেবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিজয় ছুটছে। বাগমারীর বাগানবাড়ীর ঠিকানা জানা ছিল বলেই সব ভয় উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সে এসে পৌঁছে গেল সেখানে।

থিয়েটারে যাবার সময় গাড়িতে উঠতে গিয়ে দূরে নিতান্ত অপরাধীর মত ছোট ভাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। ও বাড়ির কেউ এ বাড়িতে আসুক, কেউ তাঁর খবর রাখুক তা তিনি চাইতেন না। সুতরাং ভাইকে দেখে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, কি চাই তোমার? তুমি একা একা এতদূর?

বিজয়েন্দ্রনাথের দু'চোখ ছল ছল করে উঠল। হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, দাদা, আপনি এখুনি একবার বাড়ি চলুন-

ভাইয়ের চোখে মুখে একটা অশুভ ইঙ্গিত। অমরেন্দ্রনাথের ভিতরটা কেঁপে উঠল। বললেন, কেন! মা ভাল আছেন তো?

বিজয়েন্দ্রনাথ বলল, মা ভাল আছেন। দাদা—দাদা—বৌঠান ভাল নেই, বৌঠান অসুস্থ, আপনি এখুনি একবার চলুন। বিজয়ের স্বরে কান্না জড়ানো।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি এখন কোন মতেই যেতে পারব না, বাড়ি গিয়ে বল আমি খুব ব্যস্ত, যে কাজে ব্যস্ত সে কাজ একজনের অসুস্থতার চাইতে অনেক বেশী জরুরী—

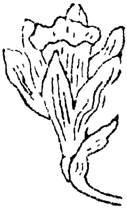
আবার অনুরোধ করল বিজয়। বার বার অনুনয় করে বলল,

দাদা, বৌঠান আপনাকে অনেকদিন দেখেননি। বৌঠানকে দেখে ডাক্তার বলেছেন এভাবে থাকলে বৌঠান বেশীদিন বাঁচবেন না, আপনি গেলে বৌঠান ভাল হবেন।

অমরেন্দ্রনাথ একমাত্র থিয়েটার গড়ার নেশায় যেন পাষাণ হয়ে গেছেন। ছোট ভাইয়ের কোন উপরোধ অনুরোধ কানে গেল না তাঁর। গাড়ি চালানোর নির্দেশ দিয়ে এবার গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি।

বোকার মত গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল বিজয়েন্দ্রনাথ।

ছুটন্ত গাড়ির ভিতরে অমরেন্দ্রনাথের পাষাণ দেহটা শুধু দুলতে থাকল।



আর-এক খেয়াল নিয়ে মেতে উঠলেন অমরেন্দ্রনাথ।

একদিকে থিয়েটার গড়া, থিয়েটার সাজানো, অসাধারণ অভিনয়, অন্যদিকে সাহিত্য আর পত্রিকা সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব নিয়ে মেতে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। শুধু পত্রিকা সম্পাদনা নয়, একটা নতুন সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠলেন তিনি।

অমরেন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা আলোচনার সঙ্গে আর একটা আলোচনা যুক্ত হয়ে গেল। একজন বলছিল, লোকটার কলজের জোর আছে, কোন্ বংশের ছেলে দেখতে হবে তো। উত্তরে আর একজন বলেছিল, আরে উঁচু পরিবারের ছেলে বলেই না সব ব্যাপারটাকে এমন সহজ করে চালু করতে পারে—

প্রশ্ন করেছিল একজন, কোন্ ব্যাপারটা ভাই? হ্যাণ্ডবিলের

কথা বলছ তো ? সত্যি, এতদিন থিয়েটার করছি, কিন্তু এমন চকচকে উঁচু দামের কাগজে ছবি ছাপা হ্যাণ্ডবিল এই প্রথম দেখলাম।

একজন বলল, শুধু কি তাই, শুনছি নট-নটীদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন অমর দত্ত, শুনছি একটা চমক লাগবার মত সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করবেন তিনি—

শ্লেষের সঙ্গে কে যেন বলেছিল, আগে সৌরভ নামে একটা কাগজ বার করে বাজারের মেয়েমানুষদের কবি তৈরি করেছিল, এবার কি করবে দেখতেই পাব—



প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় অমরেন্দ্রনাথ ফেটে পড়লেন। প্রকাণ্ড জোরে টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মেরে বলে উঠলেন, আমার কোন কাজে, কোন ব্যাপারে কোন সাক্ষী নেই, কিন্তু আজ তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি,—যারা আজও পরোক্ষ-ভাবে আমাকে ঘৃণা করে, আমাকে বুঝতে চায় না তাদের আবার একটা মোক্ষম জবাব দেব; তোমরা দেখে নিও, কিছুদিনের মধ্যে আমার এই নতুন পত্রিকার যদি এক লক্ষের বেশী গ্রাহক করতে না পারি তবে সব থেকে নিজেকে সরিয়ে আনব। যারা নট-নটী, মুখের রক্ত তুলে যারা রাতের পর রাত অভিনয় করে সবার মনোরঞ্জন করে, আমি তাদের কথা প্রচার করব, তাদের ছবি ছাপিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব, তবেই আমার শান্তি।

অমরেন্দ্রনাথ কথা রেখেছিলেন। থিয়েটারের মুখপত্র প্রকাশ

করেছিলেন তিনি। নাম রেখেছিলেন রঙ্গালয়। ত্রৈমাসিক নয়, মাসিক নয় একেবারে সাপ্তাহিক পত্রিকা।

থিয়েটারের সবাই আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। সেদিন অমর দত্ত থিয়েটারে আসতেই সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, জয় অমর দত্তের জয়, জয় আমাদের কালুর জয়—

এই জয়োল্লাসে অমর কিন্তু এতটুকুও অংশ নিতে পারলেন না। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে থিয়েটারের পিছন দিকে সব চাইতে যেটি নিরিবিলি জায়গা সেখানে গিয়ে বসলেন তিনি।

একরাশ দুশ্চিন্তার ভারে গোটা মানুষটা যেন নুইয়ে পড়েছেন। ঠিক এই মুহূর্তে এই থমথমে মানুষটার কাছে যে অতি সহজে এসে দাঁড়াতে পারে, সেই তারাসুন্দরী এসে দাঁড়ালো।

চাপা স্বরে বলল, আজ আপনার সব চাইতে আনন্দের দিন, আপনার পত্রিকা বেরুতে না বেরুতে সবার হাতে হাতে ঘুরছে. শুনলুম আপনার পত্রিকা যারা বিক্রি করছিল তারা নাকি বিক্রি করে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না, থিয়েটারের সবাই আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল আপনি থিয়েটারে এলে সবাই আপনাকে নিয়ে আনন্দ করবে. অথচ আজই আপনি এমন করে ওদের সবাইকে রেখে এখানে এসে বসলেন। শরীর খারাপ হয়নি তো ?—

কথাটা শেষ করার আগেই অমর দত্তের প্রশস্ত কপালের ওপরে হাতের তালু সযত্নে বুলিয়ে নিল তারা। একান্ত আপনজনের মত যেন সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়া।

অমরেন্দ্রনাথ আস্তে করে তারার হাতটা ধরে নামিয়ে দিতে দিতে বললেন, ঈর্ষা, বুঝলে তারা ঈর্ষার বশে শেষ পর্যন্ত পূর্ণবাবুও আমাকে হারিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন !

কিন্তু কেন এই ঈর্ষা তা জানো তারা ?

তারা এবার মাথা নাড়াল। এ সব কথার অর্থ তার কাছে বিন্দুমাত্র পরিষ্কার নয়।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, শেষ পর্যন্ত ঐ পূর্ণ গুপ্তের কাছে আমাকে হারতে হবে! না তা কিছুতেই হবে না, জানো তারা, প্রথমে ভেবেছিলুম আমার রঙ্গালয়ের সম্পাদক করবো পূর্ণ গুপ্তকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আমার উপযুক্ত বলে মনে হলো না, তাই পত্রিকার সম্পাদক করলুম ঐ পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে। আর সেই হলো পূর্ণবাবুর গাত্র দাহ। তিনি আমাকে দমিয়ে দেবেন বলে, আমাকে হারিয়ে দেবেন বলে রঙ্গালয়ের অনুসরণে একটা পত্রিকা বার করেই ক্ষান্ত হলেন না, আমার সম্বন্ধে নানা কুৎসিৎ রটনা ছড়াতে লাগলেন তাঁর কাগজে লিখিত ভাবে—

তারাসুন্দরী এবার বাধা দিলেন। বললেন, আমি সাধারণ একজন মেয়েমানুষ, আমার মুখে বড় কথা মানায় না, তবুও আপনি যখন সে অধিকার আমাকে দিয়েছেন তখন বলি, ও সব নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ওরা আজ যা বলছে কাল তা মিথ্যে হয়ে যাবে। তাই বলছিলুম কুকুর যতই ঘেউ ঘেউ করুক, মানুষের কি শোভা পায় তার জবাব দিতে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করা?

অমর দত্ত এবার সোজা হয়ে বসলেন। নিজেকে অনেকটা সহজ করে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, তবুও আমি থামবো না, আমি আমার কাজ দিয়ে পূর্ণবাবুদের মুখ চিরদিনের মত বন্ধ করে দেব।

বড় একরোখা ছিলেন অমর।

বার বার যে কথা তিনি দিয়েছেন সে কথার মর্যাদাও রেখেছেন এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। পূর্ণবাবু তাঁর ক্ষণস্থায়ী পত্রিকায় অমর দত্তের বিরুদ্ধে অহেতুক যে অপপ্রচার করছিলেন সেই অপপ্রচারের জন্য পূর্ণবাবুর বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করে বসলেন। আদালতে চলতে লাগল এক বিচিত্র মামলার যুদ্ধ। এর মধ্যে একদিন—পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত ছিল, তার দিকে তাকিয়ে অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আপনাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন পাঁচকড়িবাবু?

পাঁচকড়িবাবু কেমন যেন চমকে উঠলেন। তাঁর মুখে ভাষা ফোটার আগেই আবার অমরেন্দ্রনাথ বললেন, ভাববেন না, ভাববেন না পাঁচকড়িবাবু, যত বেশী ভাববেন ততই দেখবেন একটু একটু করে ভাবনার গোড়াটাই হারিয়ে ফেলেছেন, এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি আমি কেন প্রকাশ করেছি তা আপনি জানেন?

পাঁচকড়িবাবু জবাব দিলেন, এর চেয়ে মোক্ষম জবাব আর কি দিয়েই বা দিতেন আপনি?

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, মোক্ষম জবাব নয়, এটা ওদের আত্ম-প্রস্তুতির একটা সুযোগ মাত্র, আর সে সুযোগের অপব্যবহার আমি সহ্য করব না—

পাঁচকড়িবাবু একটা ঢোক গিলে উত্তর দিলেন, অপব্যবহার বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না—

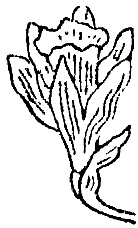
অমরেন্দ্রনাথ বললেন, কথাটা আমি বলেছি মাত্র, বোঝা না বোঝা সে আপনার ব্যাপার। পাঁচকড়িবাবু, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় ষাট হাজার টাকা লোকসান গেছে এই পত্রিকায়। যাক, তাতে আমি বিন্দুমাত্র ভাবছি না, আরও টাকা দেব—অনেক টাকা, যত টাকা আপনার প্রয়োজন হবে সব টাকা, শুধু দয়া করে যে দায়িত্ব নিয়েছেন সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করুন, সব সময় মনে রাখবেন এ পত্রিকা আপনার স্বজন পোষণের হাতিয়ার নয়, এ পত্রিকা আপনার স্বার্থ সিদ্ধি করার আধার নয়, এখনকার যারা কাগজ পড়ে তাদের কোন অনুযোগ আমি যেন শুনতে না পাই। যেমন করেই হোক, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে লক্ষাধিক পত্রিকা ছাপা হচ্ছে আমি তাই দেখতে চাই।

পাঁচকড়িবাবু উত্তর দিলেন, লক্ষাধিক! এ আপনি কি বলছেন! আরও কয়েকখানা পত্রিকা তো আছে, তা ছাড়া দৈনিক পত্রিকা-গুলিরও এদেশে কম বড় ভূমিকা নয়, কাজেই এক লক্ষ গ্রাহক সংগ্রহ করা কি চাট্টিখানি কথা?

অমরেন্দ্রনাথ একটু হাসলেন। শ্লেষের হাসি হাসলেন তিনি। বললেন, এত সামান্য অঙ্কে চমকে উঠলেন? কিন্তু পাঁচকড়িবাবু, আমি হারব না, জিততে আমাকে হবেই। যে সব কাগজ থিয়েটারকে ঘৃণা করে, যে সব কাগজ থিয়েটার শিল্পের কোন সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করতে ভয় পায়, সে সব কাগজ আর পাঁচজনের কাছে যা-ই হোক, আমার চোখে ওরা ব্যবসাদার ছাড়া আর কিছুই নয়। ওরা সমাজকে ভয় পায়, ওরা সমাজকে মূলমন্ত্র করে বেঁচে থাকতে চায় তাই থিয়েটারের বিজ্ঞাপন আর সংবাদ ছাপতে ওদের ভয়। থিয়েটারের সংবাদ ছাপলে যদি একঘরে হতে হয় সেই ভয়। আমি ওদের গড়ব। আমি ওদের ভাতে মারতে পারব না হাতেও না, কলমে মারব। শুনুন, আজই কলকাতায় প্রচার করার ব্যবস্থা করুন, যাঁরা আমাদের এই থিয়েটারের সাপ্তাহিক মুখপত্রের গ্রাহক হবেন এক বছরের জন্য আমরা তাদের গিরিশবাবুর গ্রন্থাবলী এবং আমার গ্রন্থাবলী বিনা-মূল্যে উপহার দেব—

পাঁচকড়িবাবু বললেন, এ আপনি কি বলছেন? আর্টপেপারে অভিনেত্রীদের ছবি, সংবাদ প্রবন্ধ ছাপিয়ে প্রতি কপির দাম যা দাঁড়ায়, বিক্রি করে যা পাই তা অতি সামান্য। আমি হিসেব কষে দেখেছি একখানা কাগজ ছাপতে ছয় পয়সা খরচ পড়ে অথচ আমরা পাঠকদের কাছ থেকে মাত্র দুই পয়সা নিয়ে থাকি।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, সারা জীবন ধরে হিসেব কষলে যোগফল শূন্যই থাকবে, সুতরাং হিসেব কষার ব্যাপারটা আপনি ছাড়ুন। শুনুন, নামতা পড়ে হিসেব কষে কোন বড় কিছু করা চলে না পাঁচকড়িবাবু, সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে শুধু বিনা পয়সায় গ্রন্থাবলীই দেব না, যাঁরা চাঁদা দিয়ে পত্রিকার রসিদ দেখাতে পারবেন তাঁদের এক-রাত্রিরের জন্য বিনামূল্যে আমাদের থিয়েটারও দেখতে দেওয়া হবে—



একটা সামান্য জীবনে অগণিত কাজ। প্লেগের আবির্ভাব হল কলকাতায়। মহামারী রূপে দেখা দিল প্লেগ।

চারিদিকে আর্তচিৎকার আর স্বজন হারাবার ব্যথায় কান্নার রোল। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের দল প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে যাচ্ছে একান্ত আপনার সবাইকে ফেলে। চারিদিকে দিনরাত একটা ভয়ঙ্কর ধ্বনি। শ্মশানে চিতার আগুন সব সময় দাউ দাউ করে জ্বলছে। বিরামহীন মৃত্যু যাত্রা।

অমরেন্দ্রনাথ অবিচল। কলকাতার সব থিয়েটার এই ভয়ঙ্কর প্লেগ প্রকোপের ভয়ে বন্ধ হলেও অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার করে চললেন।

সেদিন থিয়েটার শেষে অমরেন্দ্রনাথ গাড়িতে করে বাগানবাড়িতে ফিরছিলেন, এমন সময় গাড়িতে বসে দেখতে পেলেন একজন মহিলা তাঁর বাড়ির দরজার দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদছে।

গাড়ি থামাতে বললেন অমরেন্দ্রনাথ। গাড়ি থামলে তিনি নেমে এলেন। এগিয়ে গেলেন মহিলার কাছে। জানতে পারলেন এইমাত্র সে তার একমাত্র ছেলেকে হারিয়েছে। ছেলের সৎকার করার সামর্থ নেই। মড়া বাসি হয়ে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে। ওর কান্না শুনবার মতো একজনও নেই সেখানে। সব শুনে অমরেন্দ্রনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চুপ করুন, একটু শান্ত হোন, আমিই আপনার সব ব্যবস্থা করে দেব, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আবার ফিরে আসছি—

অমরেন্দ্রনাথ আবার টমটম ঘুরিয়ে ফিরে এলেন থিয়েটারে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সদলবলে ফিরে এলেন সেই মহিলার কাছে। তারপর মহিলার হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিলেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই রাত্রে সেই মৃতদেহের সংকার করলেন তিনি।

এরপর আর একদিন অমরেন্দ্রনাথ পায়চারি করছিলেন বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে। এমন সময় পাঁচকড়িবাবু একটু ব্যস্ততার সঙ্গে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, ক'টা বাজে?

পাঁচকড়িবাবু একটু ইতস্তত করে জবাব দিলেন, আজ্ঞে সামান্য দেরী হয়ে গেছে—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, মজ্জাগত দোষ, কি বলুন? কিন্তু এখন কোন ট্রেন আছে কি? আর থাকলেও আপনি কি সঠিক বলতে পারেন যে ক'টায় গিয়ে আমরা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারব?

পাঁচকড়িবাবু বললেন, একটু দেরী হবে, তবে সভা শুরু হবার আগেই গিয়েপৌঁছুব—অমরেন্দ্রনাথ বললেন, থিয়েটার আর সাহিত্যকে আমি যৌবনের উপবন ভাবতে পারিনি বলেই আজ আমার এই হাল পাঁচকড়িবাবু, জানিনে আমার স্ত্রী এতক্ষণ মারা গেছেন কিনা! যদি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে জানব আমার থিয়েটারের নেশাটা পেকেছে। আর রায়সাহেব হারাণ রক্ষিতের সাহিত্য-সভায় গিয়ে সময় মতে না পৌঁছুতে পারলে জানব, সাহিত্য-টাহিত্য ওসব আপনাদের ব্যাপার, আমার জন্যে নয়। চলুন এবার যাওয়া যাক—

অমরেন্দ্রনাথ বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখলেন সামনে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, এই কি চাই তোমার? কি চাই, সরে দাঁড়াও—

ঘোমটার ভিতর থেকে মহিলা বললেন, আপনি নিশ্চয়ই অমরবাবু

নন। যাঁর এত দয়ার মন তাঁর ব্যবহার এত খারাপ হবে না আমার বিশ্বাস—

অমরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, কে আপনি? কি চান?

এবার মহিলা একটু একটু করে সম্পূর্ণ ঘোমটা সরিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন। হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। তারপর ভেজা ভেজা স্বরে বললেন, আমি ভদ্রবংশের মেয়ে, নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এলাম—

পাঁচকড়িবাবু বললেন, গোটা দেশটা ভিখিরী হয়ে গেল! আসুন আসুন, আপনি চলে আসুন। শোন, তোমার কোন বক্তব্য শুনবার সময় নেই—

অমরেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখলেন পাঁচকড়িবাবুকে। তারপর বললেন, আমি তো জানতাম আমার স্তাবক আর পার্শ্বচরের অভাব নেই, কিন্তু আপনিও যে সেই তালিকাভুক্ত এ আমার জানা ছিল না। এবার মহিলাকে উদ্দেশ করে বললেন, বলুন, আমি আপনার সব কথাই শুনব—

মহিলা বললেন তাঁর স্বামী রোগশয্যায়। যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে আর বন্ধক দিয়েও স্বামীর চিকিৎসার টাকা জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বামীকে বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে আরও কিছু টাকার দরকার।

অমরেন্দ্রনাথ যেন সেই ক্ষণেই সেই মহিলার মুখের উপরে হেমনলিনীকে দেখতে পেলেন। অসুস্থ হেমনলিনীকে তাঁর মনে পড়ল। কিছুসময়ের জন্য অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহিলার মুখের দিকে।

লজ্জায় মহিলা মাথা নীচু করলেন। বললেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এত নীচ, এত ছোট আপনারা? আমার অবস্থার সুযোগ নিয়ে এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে আপনার লজ্জা করছে না! কথাটা শেষ করে মহিলা চলে যাচ্ছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বললেন, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। জানেন, এই মুহূর্তে আমি কেন জানিনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে একথা সত্যি, আমার দৃষ্টিতে পাপ ছিল না। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে—যাক, এই নিন, আমার কাছে যা আছে সবই আপনাকে দিয়ে আমি ধন্য হলাম। বড় ভাইয়ের এই কর্তব্যটুকু আপনি করতে দিন—

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে তাকালেন। তাঁর দুই চোখে জল। কাঁপা কাঁপা হাতে টাকাটা নিয়ে তিনি মাথা নীচু করে চলে গেলেন।

অমরেন্দ্রনাথ একটা শুকনো নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, পাঁচকড়িবাবু, আজ সাহিত্য-সভায় আমি যাব না—

পাঁচকড়িবাবু বললেন, সে কী! আপনি না গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আজ আমি ক্লান্ত পাঁচকড়িবাবু। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না, সেই সাহিত্যধর্মী জীবন নিয়ে আজ আমাকে একটু একলা থাকতে দিন—

ক্লান্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘরে ফিরে গেলেন।

অমরেন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন মধ্যাহ্ন গগনে।

প্রতিদিনকার মতো সেদিনও পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। অভিনয় শেষ করে সাজ-পোশাক পরা অবস্থায় অমরেন্দ্রনাথ গ্রীণরুমে এসে আরাম কেদারায় বসলেন।

একজন এসে খবর দিল, পূর্ণবাবু এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

অমরেন্দ্রনাথের দু'চোখে একরাশ বিস্ময়। নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে সহজ করে নিয়ে বললেন, পাঠিয়ে দাও এখানে—

লোকটি চলে গেল। এমন সময় পাঁচকড়িবাবু এসে দাঁড়ালেন, বললেন, আপনি শুনলে খুশি হবেন যে আমাদের পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, পাঁচকড়িবাবু, পর পর ক'দিন থিয়েটারের একটা সিটও খালি নেই দেখে একথা বুঝতে বাকি নেই যে, আমাদের পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে। হাউস ফুল, অথচ মাত্র কয়েকশো টাকা বিক্রি! তার মানে পত্রিকার গ্রাহকে থিয়েটার পূর্ণ। আচ্ছা, আপনি এখন আসুন—

অমরেন্দ্রনাথের কথা শেষ হতে না হতেই পূর্ণবাবু এসে দাঁড়ালেন।

অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সুন্দরভাবে, মধুর ব্যবহারে পূর্ণবাবুকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বসতে দিলেন সামনের চেয়ারে। বললেন, আজ হঠাৎ এখানে কি মনে করে? কেন কষ্ট করে পকেটের টাকায় থিয়েটার দেখলেন, যদি দয়া করে খবর পাঠাতেন, এই অধীন আপনাকে এক সেট পাশ পাঠিয়ে দিত।

পূর্ণবাবু বললেন, আজ আমি থিয়েটার দেখতে আসিনি অমরবাবু, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

অমরেন্দ্রনাথ একটু হাসলেন, বললেন, আসা ছাড়া আর কোন পথই আপনার সামনে খোলা ছিল না, তাই নয় কি! যাক, আজ আপনি আমার পরম আত্মীয়, আপনি আমার অতিথি। সুতরাং একলা পেয়ে আমি আপনাকে বিন্দুমাত্র আঘাত করব না। বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

পূর্ণবাবু বললেন, আমি আপনার নামে যে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলাম, সেই মামলা আমি তুলে নিলাম। মাথা নত করে আমি আমার দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

হাসলেন অমরেন্দ্রনাথ।

বললেন, এভাবে বললে আমি আঘাত পাব, আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না। মানহানির মামলা আপনি কার সঙ্গে করেছিলেন?

পূর্ণবাবু বললেন, আপনার সঙ্গে—আপনার পত্রিকার সঙ্গে—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, না, আমার সঙ্গে নয়, আমার পত্রিকার সঙ্গেও নয়। আপনি মানহানির মামলা দায়ের করেছেন আজকের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে। ক্ষমা তাদের কাছে চাইবেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললেন, ভেবেছেন শুধু নিজেদের কথা। তাই পত্রিকার ব্যবসায় নেমে সেই স্বার্থপর মনটাকে আপনারা আরও জটিল করে তুলেছেন। যাঁরা থিয়েটার নোংরা বলে চেঁচায় তাদের স্বপক্ষে আপনারা কলম ধরেন। আমার দোষ আমি আপনাদের মুখোসগুলো টেনে খুলতে চেয়েছিলাম, তাই এই মানহানির মামলা। অপূর্ব! আমার অনুরোধ, থামবেন না পূর্ণবাবু, মামলা চালিয়ে যান, যদি হেরে যান তাহলে সম্পদচ্যুত হবেন, আপনিও এসে দাঁড়াবেন সাধারণ মানুষদের মাঝখানে, তখন কেমন করে মুখ দেখাবেন ভেবে দেখেছেন ?

নিতান্ত অপরাধীর মতো পূর্ণবাবু বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি সাহায্য না করলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাকে পথে নামতে হবে। মামলার খরচ চালাতে গিয়ে আমি আজ সর্বস্বান্ত। আমার পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেছে, সংসার একেবারে অচল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—

অমরেন্দ্রনাথের ভিতরটা ছিল সোনার মতো খাঁটি, তুলোর মতো নরম। পূর্ণবাবুর কথা শুনে নরম হলেন তিনি। বললেন, ক্ষমা চেয়ে আমাকে ছোট করবেন না, বলুন সহযোগিতা করতে। আমি কথা দিলাম অর্থের অভাবে আপনার পত্রিকা বন্ধ হবে না। যখনই টাকার দরকার হবে দ্বিধা না করে চলে আসবেন, আমি প্রস্তুত থাকব।

পূর্ণবাবু মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিলেন। বাধা দিলেন অমরেন্দ্রনাথ। তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলে নিজে টিকিট কাউণ্টার থেকে সেদিনকার টিকিট বিক্রির সব টাকা নিয়ে এসে হাসিমুখে পূর্ণবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আপনার সংসার যাতে

চলতে পারে তার জন্য এই টাকাগুলো রেখে দিন আর মামলা আমিও তুলে নিলাম।

অমরেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণবাবুর মাথা তেমনি নতই থেকে গেল।

উল্কার মতো অমর দত্ত ছুটছেন।

নাটকের পর নাটক করলেন, চারিদিকে চরম খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু অমর দত্ত কিছুতেই শান্ত হতে পারলেন না। শুধু খ্যাতি এলেই তো চলবে না, চাই টাকা। টাকা না এলে সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। অমর দত্ত অস্থির হলেন। টাকা চাই, থিয়েটারের বিনিময়ে টাকা চাই।

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ভিতর থেকে উত্তেজনায় যেন ফুলতে লাগলেন তিনি। ছুটে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ছুটে গেলেন থিয়েটারের বন্ধুদের কাছে।

অমরবাবুকে এই ভাবে ছুটে আসতে দেখে সবাই একটু জড়সড়ো হয়ে গেল। অমরবাবু পাগলের মতো ছুটে এসে সকলের সামনে দাঁড়ালেন। নিজেকে সংযত করে বললেন, দেখ, আমি ঠিক করলাম থিয়েটার থেকে যদি টাকা না আসে তা হলে থিয়েটার থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যেও না—

দলের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন একজন। তিনি সবার দিকে তাকিয়ে বারকতক ঢোক গিলে বললেন, আপনি অল্পতে বড় উতলা

হয়ে পড়েন—আমাদের নিয়ে আপনার দুর্ভাবনার কোন হেতু নেই—

এবার ধর্মদাস উঠে দাঁড়ালেন। অমর বললেন, আপনি কিছু বলবেন ধর্মদাসবাবু ?

ধর্মদাস বললেন, থিয়েটার থেকে আশাতীত টাকা আয় না হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমাদের জন্যে যতটা ভেবেছেন, যা করেছেন তা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করবো।

অমর বললেন, নানাভাবে পরীক্ষা চালালাম, একটার পর একটা নাটকে চমকের পর চমক এনে দিলাম, কিন্তু কেন জানিনে আমাদের দর্শক টাকা দেবার ব্যাপারে কোথায় যেন বড় রকমের হিসেবী।

একজন বলে উঠলেন, তাই তো দেখছি, আপনি বরং নতুন নাটক খোলার কথা ভাবুন—

অমর বললেন, হ্যাঁ তা ভেবেছি; আর সেই কথা বলতেই আপনাদের কাছে এসেছি আমি—কোন নতুন নাটক নয়, এবার খুলবো ক্ষীরোদবাবুর আলিবাবা। ইতিপূর্বে এই আলিবাবা যদিও অনেক থিয়েটারে হয়ে গেছে—তবুও আমি নতুন করে খুলবো আলিবাবা। জীবন্ত করে তুলবো গুহার অভ্যন্তরের দৃশ্য। মনি-মুক্তা-হীরা জহরতের জৌলুসে দর্শকরা পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে,—আমি দেখতে চাই দর্শক টাকা দেয় কিনা—

কনসার্ট বেজে উঠলো। যন্ত্র মূর্চ্ছনায় দর্শকপূর্ণ ক্লাসিক থিয়েটার নিস্তব্ধ নিথর।

যবনিকা উঠে গেল। শুরু হলো নাটক।

শুরু থেকেই দর্শক মনে একটা ঝড় তুলে দিল আলিবাবা। জীবন্ত ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে এসে ডাকাত দল যখন মন্ত্রবলে পর্বতের কঠিন দরজা উন্মুক্ত করে দিল, প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে উঠল করতালিতে।

মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের এই কীর্তির খবর ছড়িয়ে পড়ল গোটা কোলকাতায়।

থিয়েটারে উপচে পড়তে লাগল দর্শক। একটানা চলতে লাগল পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আলিবাবা।

এই একটি নাটকেই অমরেন্দ্রনাথ আয় করলেন লক্ষাধিক টাকা। আলিবাবা গোটা থিয়েটারের চেহারাটা পাল্টে দিল। সোনা দিয়ে মুড়ে দিল অমর দত্তের সারা জীবনের স্বপ্নকে।

এরপর থেকে অমর দত্তের বিজয় রথের চাকা ঘুরে গেল দুরন্ত গতিতে। অমর দত্তের এই খ্যাতি আর আর্থিক প্রতিষ্ঠায় মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা ভিতরে ভিতরে যেন জ্বলে উঠল। ওরা উঠে পড়ে লেগে গেল, কেমন করে অমর দত্তকে প্রতিহত করা যায়।

মিনার্ভা থিয়েটারও ঘোষণা করল আলিবাবার নাম। পাশাপাশি দু'টি থিয়েটারে এক নাটক।

বিডন ষ্ট্রীটে একটা প্রতিযোগিতার হিল্লোল বয়ে যেতে লাগল।

অমরেন্দ্রনাথ এতটুকুও বিচলিত হলেন না। দর্শকদের আদালতে ক্ষমতার লড়াই-এর বিচার চলবে, দর্শক রায় দেবে। শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবে দর্শক এই সান্ত্বনা বুকে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ শুধু মুহূর্ত গুণে চললেন। মাঝে মাঝে ছুটে যান টিকিট ঘরে।

ঠিক এমনিভাবে একদিন অমর দত্ত এসে দাঁড়ালেন টিকিট ঘরের সামনে। দর্শকরা কেউ টিকিট কিনছে কিনা সেইটুকু দেখবার জন্য টিকিট ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। চমকে উঠলেন অমর দত্ত। থিয়েটারের সামনে লোকে লোকারণ্য। টিকিটবাবু টিকিট বিক্রির ব্যাপারে রীতিমত হিমসিম খাচ্ছেন। ভাগ্য রথের চাকা গেল ঘুরে।

মিনার্ভা থিয়েটারের সূর্য ডুবে গেল অসময়ে। মিনার্ভার এমন অবস্থা হলো, দর্শকের অভাবে থিয়েটার বন্ধ হবার মুখে এসে দাঁড়াল।

অমর দত্তের থিয়েটারে তখন জনস্রোত। দিন রাত অফুরন্ত

কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন অমর দত্ত। একের পর এক নাটকে শুধু অভিনয় নয়, সেই সংগে অমর দত্ত মেতে গেলেন নাট্য রচনায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করলেন অমরেন্দ্রনাথ। নাম দিলেন 'ভ্রমর'। একদিকে অভিনয় অন্যদিকে নতুন নাটকের রিহার্সাল সমান ভাবে চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। যথা সময়ে ভ্রমর এল মঞ্চে।

গোবিন্দলালরূপী অমর দত্ত জীবন্ত ঘোড়ায় চেপে ঝড়ের বেগে এসে দাঁড়ালেন দর্শকদের সামনে।

স্তম্ভিত হলেন দর্শকরা। ভ্রমর চরিত্রে কুসুমকুমারীর অভিনয়ে দর্শকদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সকলের মুখে মুখে একটি কথা প্রচার হয়ে গেল, অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল। আশ্চর্য নটী কুসুমকুমারী।

কুসুম!

নামের সংগে দেহের আর দেহের সংগে কাজের কী অপূর্ব মিল! নটী কুসুমকুমারী তাই বোধকরি, চেহারা আর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতায় দর্শকদের মন জয় করে নিতে পেরেছিল। সেই সংগে কখন যে কুসুম আর একটা মানুষের মনের রাজ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে ফেলেছিল হয়তো নিজেও তা জানতো না।

যে রাজ্যের নির্মল আকাশে হেমনলিনীর মতো একটিমাত্র তারার জ্বল জ্বল করে থাকার কথা ছিল, সেই আকাশে হেমনলিনীর মতো তারাটিকে ম্লান করে দিয়ে উঠেছিল আর এক তারা।

মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে সেই হেমনলিনীর মতো ধ্রুবতারাটির সবটুকু জৌলুস মুহূর্তে ম্লান করে দিয়ে, ভোরের একমাত্র শুকতারার মতো জ্বলে উঠেছিল কুসুমকুমারী। অমর দত্তের মনের আকাশে ভোরের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ছড়িয়ে কুসুম তার সব অধিকারটুকু বিস্তার করে বসেছিল।

কুসুমকুমারীকে ভালবেসে ফেলেছিলেন অমর দত্ত। কুসুমের কোন কথাই তাই ব্যর্থ হয়ে যেত না কোনদিন।

কুসুমের কোন আব্দারই তাই হয়তো অমরেন্দ্রনাথ ঠেলে ফেলতে পারেননি কোনদিন।

সেদিনও তেমনি এক আব্দার নিয়ে অমর দত্তের কাছে এসে দাঁড়াল কুসুম। বলল, নীরদাকে আমি আমাদের কাছে রাখবো ঠিক করেছি—

অমর দত্ত বললেন, বেশ তো—তুমি যখন কথা দিয়েছ তখন তো ঠিকই আছে—

কুসুম আবার বলল, মেয়েটা আমাদের বাগানবাড়ীতে থাকবে, ফাইফরমাস খাটবে সেই সংগে লেখাপড়া করবে—

অমরবাবু এবার বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলে কুসুমের দিকে তাকালেন।

কুসুম বলল, হ্যাঁ, ওর লেখাপড়ার ওপরে খুব ঝোঁক। আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন তাহলে হেদোর পিছনে সাহেবদের যে ইশ্কুল আছে, ঐ ডাফ্ ইশ্কুল, ওখানেই ওকে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে—, একটু বড় হলে ইশ্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে যদি থিয়েটারে ঢুকিয়ে নেন, থিয়েটার শেখান, তাহলে একদিন ও নিজের পথ নিজেই বেছে নিতে পারবে—

অমরেন্দ্রনাথ একটু হাসলেন। কুসুমের মনের ভিতরটা কতখানি উদার শুধু সেই কথা ভেবেই অমর দত্ত হেসেছিলেন। খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, নীরদা বলতে তো তুমি সেই মেয়েটির কথা বলছো? আমাদের থিয়েটার পেরিয়ে যে খোঁড়া সাহেবের বাগান, সেই বাগানের বস্তির ঘরে মায়ের সংগে থাকে?—

কুসুম এবার একটু ভারাক্রান্ত হলো।

বললো, ওর মা এক বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে—বাপ দেখে না—মেয়েটিকে দু'বেলা খেতে দিতে পারে না ওর মা—, আমাকে তাই ধরেছিল—

অমর দত্ত বললেন, এবার বুঝেছি। মেয়েটিকে একদিন মাত্র দেখেছিলুম, তখনই বুঝেছিলুম, মেয়েটিকে যদি ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে ভাল একটি নটী হবে—, বেশ —তুমি নীরদাকে তোমার কাছে আনবার ব্যবস্থা কর—

কুসুমকুমারী চলে গেল। অমরেন্দ্রনাথ ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়লেন।

নীরদার বয়স কল্পনা করে নিতে গিয়ে হয়তো তাঁর মনের পর্দায় একটা মুখ ভেসে উঠল। নীরদার এখন যে বয়স, নীরদা এখন যেমন বালিকা, মনের পর্দায় ভেসে ওঠা সেই মুখ যার, সেও হয়তো এতদিনে বালক। সে আর কেউ নয়, নসীরাম। নিজের একমাত্র ছেলের কথা এই মুহূর্তে যেন বড় বেশী করে মনে পড়ল অমরেন্দ্রনাথের। ভিতরকার পিতার চেহারাটা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর। একমাত্র ছেলে সত্যেন আর হেমনলিনীকে দেখার আর ওদের কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষায় যেন অমরেন্দ্রনাথের ভিতরটা টন টন করে উঠল। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে—অতীতের সব ঘটনার কথা স্মরণে এনে অমরেন্দ্রনাথ ঠিক যখনই হাতীবাগানের বাড়ীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ধর্মদাস এসে দাঁড়ালেন। একটা আনন্দ আর খুশীর রেখা যেন ধর্মদাস সুরের সারা চোখ-মুখের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অত্যন্ত ব্যস্ত আর ভারাক্রান্ত অমরেন্দ্রনাথকে দেখে ধর্মদাস একটু ম্লান হলেন মাত্র। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আপনি বেরুচ্ছেন ?

অমর বললেন, হ্যাঁ, কেন কিছু জরুরী কথা বলবেন ?

ধর্মদাস বললেন, বলছিলাম, মাননীয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর আজ আমাদের থিয়েটারে আসবেন বলে খবর পাঠিয়েছেন—

কথাটা অমরেন্দ্রনাথের কানে যেতেই তিনি একটু একটু করে কেমন যেন পাল্টে যেতে লাগলেন। ঝাড় লণ্ঠনের এক টুকরো খাঁজ-কাটা, পল্ তোলা কাঁচের ওপরে চোখ রেখে সেই কাঁচটুকরো ঘোরালে যেমন রামধনু রং দেখা যায়, যেমন রং বদলায়—অমর দত্তের এতক্ষণের ফ্যাকাশে-ভারাক্রান্ত মুখের ওপর দিয়ে যেন তেমন রং বদলাতে লাগল। একদিকে প্রচণ্ড আনন্দের রং—অন্যদিকে নিজের একান্ত আপনজনদের আবার ভুলে যেতে হবে সেই ভাবনার যন্ত্রণাক্লিষ্ট রং যেন অমরেন্দ্রনাথের মুখের দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ল।—

আবার তিনি ভুলে গেলেন সেই হাতীবাগানের বাড়ী, হেমনলিনী আর একমাত্র ছেলের কথা।

সেদিন থিয়েটারের ভিতরে আর বাইরে লোকে লোকারণ্য।

যথা সময়ে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের গাড়ী এসে দাঁড়াল থিয়েটারের সামনে। অমর দত্ত আর তাঁর থিয়েটারের সবাই এগিয়ে এসে যতীন্দ্রমোহনকে রীতিমত রাজকীয় সম্মান দেখিয়ে থিয়েটারের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

এবার যতীন্দ্রমোহন এসে দাঁড়ালেন মঞ্চে।

দর্শকদের ওপর থেকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে যতীন্দ্রমোহন বললেন, আজ আমি আপনাদের সামনে, এই রঙ্গশালার ওপরে এসে দাঁড়িয়েছি একটি নৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করতে। এই নৈতিক কর্তব্য বোধটুকু যদি আমরা দেখাতে না পারি তাহলে বহু রঙ্গমঞ্চের এবং রঙ্গমঞ্চের যাঁরা সাধক তাঁদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো যাবে না।

আমি এসেছি তেমনি একজন সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। বঙ্গীয় নাট্যশালার সর্বতোমুখী উন্নতি সাধনহেতু শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথের

যে দুঃসাহস এবং অসীম আত্মত্যাগের পরিচয় ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি তাতে অভিভূত হয়ে আমি আজ তাঁকে একটি স্বর্ণপদক উপঢৌকন হিসেবে দিতে এসেছি। এই দেখুন সেই স্বর্ণপদক—

যতীন্দ্রমোহন এবার লাল ফিতেয় ঝোলানো সোনার মেডেলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন দর্শকদের।

হাতে তালি দিলেন দর্শকরা। গোটা প্রেক্ষাগৃহ হলো আন্দোলিত।

এরপর অমরেন্দ্রনাথকে কাছে দাঁড় করিয়ে যতীন্দ্রমোহন নিজে হাতে তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন জয়ের মালা।

ঠিক এমন সময় দর্শকদের ভিতর থেকে উঠল একটা গুঞ্জন।

একজন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমরা কয়েকজন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্য একটি অভিনন্দন পত্র এনেছি, সেটি সর্বসমক্ষে শোনাবার পর বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে তুলে দিতে চাই।

আবার করতালি ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল প্রেক্ষাগৃহ। দর্শকদের মধ্য থেকে কয়েকজন উঠে গেলেন মঞ্চে। মানপত্র পড়ে শোনালেন তাঁরা। মানপত্রে লেখা ছিল—"বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত দি গ্যারিক অব বেঙ্গল—"

মদের বোতলের ওপরে একবার ভাল করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন গিরিশচন্দ্র।

বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে অনেকখানি মদ গলায় ঢেলে দিলেন

তিনি। এরপর একটু একটু করে আকণ্ঠ পান করলেন সেই মদ। মদের নেশায় কচুর পাতায় জলের মতো গিরিশচন্দ্রের গোটা দেহটা টলমল করে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে দরজার কাছে অমরেন্দ্রনাথকে দেখে গিরিশবাবু নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। যতবার তিনি অমরেন্দ্রনাথকে দেখতে চান স্পষ্ট করে, ঠিক ততবারই যেন অমরেন্দ্রনাথ গিরিশবাবুর চোখের আলোয় ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে যান। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে জড়ানো স্বরে গিরিশ-বাবু বললেন, ওঃ কালু? এস—এস—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, থাক, আর ভিতরে যাব না—আপনি ঠিক এই সময়ে যে এইভাবে থাকবেন তা বুঝতে পারিনি, আমি বরং পরে আসব—

হাত থেকে মদের বোতলটা নামিয়ে রেখে গিরিশচন্দ্র বললেন, দেখ অমর, তোমার হয়তো জানা নেই, আমি যখন মদ খাই না, তখন লোকে আমাকে বলে বাগবাজারের নেত্বড়ে গিরিশ—, আর যখন আমি মদ খাই তখন হই গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুতরাং আমি মনে করি, এটাই একটা প্রশস্ত সময় যখন তুমি আমাকে যা খুশি বলতে পারবে আমিও তা বুঝতে পারব—

এবার অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে দ্বিধা। অনেক কষ্টে সেই দ্বিধা সরিয়ে অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আজ প্রায় ন'মাস হলো আপনি পুনরায় আমার এই ক্লাসিকের সংগে জড়িত হয়েছেন, আপনার সংগে আমার চুক্তি ছিল আপনি থিয়েটারের প্রয়োজনবোধে নাটক দেবেন, কিন্তু আপনি তা দিলেন না—

গিরিশবাবু আবার নেশায় জড়ানো স্বরে বললেন, কেন? 'দেলদার' তো দিয়েছিলুম—

অমরবাবু বললেন, তারপরে আর আপনি লিখলেন না, এদিকে আমার পক্ষে থিয়েটার চালানো যে কত কষ্টসাধ্য হয়েছিল তাও

জানেন, আপনাকে বার বার বলা সত্ত্বেও যখন নাটক দিলেন না, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে নাটক লেখার ব্যাপারে নামতে হলো। আপনি তো জানেন 'ভ্রমর' নাট্যরূপ দিয়ে আমি কতটা খ্যাতি পেয়েছি—ব্যবসায়িক দিক থেকে কতটা লাভবান হয়েছি—কিন্তু আমি চাই আপনি আবার নতুন নাটক দেবেন—

আবার খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিলেন গিরিশবাবু। চাপা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন তিনি। রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, একটা কথা তুমি ভুলে যেও না অমর, যে আমারই জন্য তোমার এই প্রতিষ্ঠা, আমি তোমায় নাটক দেব, কিন্তু তার আগে কথা দাও যে স্যালাইনের বিনিময়ে তুমি আমাকে থিয়েটারের শেয়ার দেবে। আমাকে শেয়ার দেওয়া উচিত—

এবার অমরেন্দ্রনাথের মুখের ওপরে চিন্তার রেখা পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সহজ করে বললেন, আপনি নাট্য জগতের পিতা, কাজেই আপনি যে আমার থিয়েটারে আছেন তা আমার থিয়েটারের গৌরব, কিন্তু তা বলে আমি স্বীকার করতে বাধ্য নই যে, আমার এই প্রতাপ প্রতিপত্তির মূলে আপনার কৃতিত্ব। আমার থিয়েটার চলছে আমার নাটকের জোরে। এ পর্যন্ত যত নাটক আমার থিয়েটারে হয়েছে তার মধ্যে আপনার নাটক তো মাত্র একখানা। সুতরাং এ সব জেনেও থিয়েটারের বখরা চাওয়া কি আপনার উচিৎ? না, আপনার এই অন্যায় দাবীকে আমি কোনমতেই মেনে নিতে পারিনে—

কথাটা কানে ঢুকতেই দপ্ করে জ্বলে উঠলেন গিরিশচন্দ্র। উত্তেজনায় কাজ হবে না বলেই বোধ হয় তৎক্ষণাৎ নিজেকে অনেকটা নরম করে, কণ্ঠস্বর অনেকটা খাদে নামিয়ে বললেন, আমাকে শেয়ার দিলে তোমার লাভ হবে, কারণ আমি তোমার থিয়েটারে থাকা মানে তোমার থিয়েটারের গৌরব বৃদ্ধি, আর সেই গৌরব রক্ষার্থে আমাকে যদি বখরা দিয়ে ধরে রাখ তা হলে আমি তোমার থিয়েটার ছাড়া অন্য কোন থিয়েটারে যাব না—

অমরেন্দ্রনাথ এবার আরও অনেকটা সহজ হলেন। আরও অনেকটা স্পষ্ট হলেন। পরিষ্কার করে বললেন, দেখুন আমার স্পষ্ট কথা বলতে কোনদিন বাধেনি, তাই বলছি, আপনি যদি আমার সর্বনাশ চান তা হলে দলবল সমেত আপনি আমার থিয়েটার ছেড়ে চলে যেতে পারেন, তা বলে বখরা দিতে অক্ষম জানবেন—

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে সেদিন গিরিশবাবুর বাড়ী থেকে চলে এলেন অমরেন্দ্রনাথ।

কিন্তু এতটুকু দুশ্চিন্তা নিয়ে এলেন না। দুশ্চিন্তা দেখা দিল দু'দিন পর।

গিরিশচন্দ্র দক্ষযজ্ঞ নাটকে হাসিমুখে অভিনয় করে সেই যে চলে গেলেন আর ফিরে এলেন না ক্লাসিক থিয়েটারে।

অমর দত্ত বুঝলেন গিরিশবাবু আর থিয়েটারে আসবেন না। কিন্তু অমরবাবু ছাড়বার পাত্র নন, মনের সংগে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত এক সময় সরাসরি হাজির হলেন গিরিশবাবুর কাছে। গিরিশবাবুর ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন অমরেন্দ্রনাথ। ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। চেনা স্বর বলে একরাশ কৌতূহল নিয়ে বাইরে দাঁড়ালেন অমরেন্দ্রনাথ। কান পেতে শুনতে লাগলেন ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসা কথাগুলো।

ঘরের ভিতর তখন মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক নরেন্দ্রনাথ।

ক্লাসিক থিয়েটারের সংগে পরোক্ষ সমর বেধেছে শুনেই নরেন্দ্রনাথ সরকার এসেছেন গিরিশবাবুকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যেতে। নরেন্দ্রনাথ হাত কচলে বার কতক ঢোক গিলে চাপা স্বরে বললেন, এর পরেও কি আপনি ক্লাসিকে ফিরে যাবেন বলে ভাবছেন গিরিশবাবু?

গিরিশবাবু বললেন, আমি তো তোমাকে বললাম নরেনবাবু. অমর আমাকে বুঝতে চায়নি, সে ছেলেমানুষ বলে আমার মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলেছে, আমি তাই একটু অভিমান করেছি,

থিয়েটারে যাওয়া দু'দিন বন্ধ করেছি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এখনও ঠিক করিনি যে ক্লাসিক ছেড়ে তোমার মিনার্ভায় যাব কিনা—

নরেন্দ্রনাথ বললেন, অমরবাবু আপনার মুখের ওপর শুধু স্পষ্ট কথা বলেছে ? আমি তো শুনেছি, সে আপনাকে রীতিমত অপমান করেছে, তাই আমি বলছিলুম কি, আপনিও অপমান হজম করে এই বয়সে আর ক্লাসিকে যাবেন কেন? বরং আসুন আমার মিনার্ভায়, আমি আপনাকে মাথায় করে রাখবো—

বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। যতক্ষণ কথাগুলো তাঁর কানে এসে বাজছিল ঠিক ততক্ষণ ধরে ভিতরকার রক্ত যেন তাঁর টগবগ করে ফুটছিল। সেই উত্তেজনার বিন্দুমাত্র প্রকাশ না ঘটিয়ে অমরেন্দ্রনাথ সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়লেন। অমর দত্তকে দেখে নরেন্দ্রনাথ যেন চমকে উঠলেন। যেখানে বাঘের ভয় নেই, সেখানে বাঘের আবির্ভাব ঘটলে মনের অবস্থা যেমন হয় নরেন্দ্রনাথের অবস্থাও ঠিক তেমনি। এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য নরেন্দ্রনাথ যেন পথ খুঁজতে লাগলেন। অমরেন্দ্রনাথ বললেন, যার মাথাটা সোনা দিয়ে মোড়া সিংহাসন, সে হঠাৎ সেই মাথা নত করে চোরের মতো বেরিয়ে যাবে কেন ? আপনি বসুন নরেনবাবু—

নরেন্দ্রনাথ বললেন, না মানে আমি আর বসবো না, থিয়েটার নিয়ে কিছু আলোচনা ছিল গিরিশবাবুর সংগে, তাই এসেছিলুম—

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি তো জানতে চাইনি আপনি কেন এসেছিলেন, যখন নিজে থেকেই বললেন, তখন তার উত্তরে আমি বলি, কথা যদি শেষ হয়ে থাকে আপনি যান, আমি আলোচনায় বসবো—,তবে নিশ্চিন্তে থাকুন মেয়েমানুষের মতো অন্য কোন থিয়েটারের মালিক সম্পর্কে গিরিশবাবুর কান ভারী আমি করবো না—

নরেন্দ্রনাথ আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন। অমরেন্দ্রনাথ এবার গিরিশবাবুর চোখের ওপরে চোখ রেখে নির্ভিক ভাবে বললেন,

আমি শুনলুম আপনি নাকি ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে আবার মিনার্ভায় যাবার মতলব করছেন, এ কথা যদি সত্যি হয় তা হলে খুব দুঃখের কথা হবে। আপনি এখানে যে সম্মানের সংগে ছিলেন, অন্য কোথাও গেলে, আপনি যে ব্যবহার করেছেন সেখানে গিয়ে সেই ব্যবহার করলে এই সম্মান পেতেন না। ব্যাপারটা মাথাটা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখুন, আপনি কী ব্যবহার আমার সংগে করছেন এবং করেছেন—

গিরিশচন্দ্র এ কথার উত্তরে কোন কথাই বললেন না। আলমারী থেকে মদের বোতল নামিয়ে অনেকখানি মদ শুধু ঢেলে দিলেন গলায়।

অমরবাবু বললেন, আপনার সংগে কথা ছিল বছরে চারখানা নাটক আপনি দেবেন, তার মধ্যে একখানা নাটক আজ পর্যন্ত দিয়েছেন। ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি যে বই-টই লেখা আপনার দ্বারা আর হবে না, ও আমি চালিয়ে নিয়ে যাব। আজ শুধু একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি, কথা দিন আমার অনুরোধ রাখবেন—

গিরিশবাবু বললেন, বলো তোমার কি অনুরোধ—

অমর বললেন, আমি প্রতি মাসে নিজে এসে আপনার মাইনের তিনশো টাকা পৌঁছে দিয়ে যাব, আপনি এই টাকাটা নিয়ে বাড়ীতে থাকুন, দয়া করে এই বয়সে জেদের বশবর্তী হয়ে অন্য থিয়েটারে গিয়ে ধার্ষ্টামো করবেন না, তা হলে আপনি কলঙ্কিত হবেন—

কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

গিরিশচন্দ্র হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে উঠলেন, অবিনাশ—অবিনাশ—

চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন গিরিশবাবুর নিত্য সহচর অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

গিরিশবাবু বললেন, এই যে অবিনাশ, কালু যা বলে গেল সব শুনেছ?

অবিনাশ বলল, হ্যাঁ শুনেছি—

গিরিশবাবু বললেন, আমি কি একমাত্র দেলদার ছাড়া আর কোন বই কালুকে দিইনি ?

অবিনাশ বললে, আজ্ঞে না, চুক্তি মতো বাকি তিনখানা বই এখন অমরকে দিতে হবে—

এবার ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে বলে উঠলেন গিরিশ, অবিনাশ, এখুনি তুমি আমার সামনে দোয়াত কলম নিয়ে বোসো, আমি বলে যাব, তুমি লিখবে,—

সেই মুহূর্ত থেকে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মেতে গেলেন সৃষ্টির নেশায়।



প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ল ছাত্রের দল।

ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকার সামনে একদল ছাত্র মিলিত হয়ে অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চিৎকার শুরু করল। একটা প্রচণ্ড রকমের ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিল গোটা কোলকাতায়। ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকার সামনে তারা এক সময়ে মিলিত হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, অমর দত্তের দৌরাত্মপনা আমরা কিছুতেই সহ্য করবো না, ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকার সম্পাদক যদি আমাদের এই প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ না করেন, আমরা ছাত্রেরা অমর দত্তের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি, সেই বিক্ষোভের আগুন এসে পড়বে এই ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকার আপিসে, আমরা পত্রিকার এডিটর নরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই—

পত্রিকা দপ্তরে তখন একরাশ কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন।

ছাত্রদের সুতীব্র চিৎকার গিয়ে পৌঁছল নরেন্দ্রনাথের কানে। একটা দুর্ভাবনার রেখা ফুটে উঠল নরেন্দ্রবাবুর চোখে-মুখে। হাত থেকে কলম নামিয়ে নরেন্দ্রনাথ সেন বেরিয়ে এলেন বাইরে।

বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামনে এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথ।

ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকার রাশভারী এবং খ্যাতনামা সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনকে দেখা মাত্র ছাত্ররা সংযত হলো। নরেন্দ্রবাবু বললেন, ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকার সামনে আজ তোমরা, ছাত্ররা সমবেত হয়ে যে কারণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছ, আমি সেই কারণ প্রসঙ্গে অবহিত আছি—

ছাত্রদের ভিতর থেকে একজন এগিয়ে এসে নির্ভিকভাবে বলল, ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মজা নামে যে নাটক খুলেছেন, সেই নাটকের লেখক স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমরা মনে করি অমরবাবু এই নাটকে মেসের দৃশ্যে আমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের প্রতি অবিচার করেছেন, আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এনেছি, আপনি ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকায় আমাদের এই প্রতিবাদগুলো ছাপবেন বলে কথা দিন—

নরেন্দ্রনাথ সেন বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতিবাদপত্রগুলি দিয়ে যাও—আমি ছাপবো, শুধু তাই নয় তোমাদের এই প্রতিবাদের ওপরেও যদি কেউ প্রতিবাদ পাঠায় আমি তাও ছাপবো—

নরেন্দ্রনাথ সেনের কথা শেষ হতে না হতেই ছাত্রজনতার বূহ ভেদ করে এগিয়ে এলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথ মুহূর্তে কিছুটা বিচলিত হলেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এসো এসো অমর—, তারপর ছাত্রদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা যাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছো, সেই নট ও নাট্যকার স্বয়ং বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তোমাদের সামনেই হাজির হয়েছেন—

নরেন্দ্রবাবুর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসতে না আসতেই যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল। এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠল

ছাত্ররা, অমর দত্তের সংগে আমরা কোন কথা বলতে চাই না, আমরা শুধু তাঁকে স্পষ্ট করে বলতে চাই, তিনি যদি মজা নাটক থেকে ছাত্রাবাসের দৃশ্য বর্জন না করেন, আমরা তার সমুচিত শিক্ষা দেব,—আমরা কিছুতেই এই অপমান সহ্য করবো না—

এবার অমরেন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। ছাত্রদের দিকে একবার ভাল করে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, তোমরা অপমান সহ্য করবে না, সমুচিত শিক্ষা দেবে,—তোমরা ছাত্র, দেশের এবং জাতির মেরুদণ্ড, সুতরাং আমার জানা নেই কেন এবং কিসের অপরাধে তোমরা কতটা সমুচিত শিক্ষা দেবে। তোমরা যদি ছাত্র না হতে তাহলে এ কথাই ধরে নিতুম একমাত্র প্রহার ছাড়া আমাকে আর কোনভাবে শিক্ষা দিতে তোমরা পারবে না। আমাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার আগে তোমরা কি বলতে পারো আমার অপরাধ কি?

ছাত্ররা মিলিত চিৎকারে বলল, আপনি মজা নাটকে ছাত্রাবাসের যে দৃশ্য তৈরী করে ছাত্রদের যে ভাবে দেখিয়েছেন তাতে আমরা মনে করি ছাত্র-সমাজকে অপমান করা হয়েছে—

অমরেন্দ্রনাথ এবার কি যেন ভেবে নিলেন। অত্যন্ত সহজভাবেই বললেন, না, ছাত্রদের অপমান আমি করিনি, ছাত্রদের যদি এইটুকু বুঝবার ক্ষমতা না থাকে কোন্‌টাতে অপমান আর কোন্‌টাতে সম্মান তাহলে আমি সত্যিই মর্মাহত। মজা নাটকে, ছাত্রদের বর্তমান গতিবিধি, ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র, ছাত্রদের মেরুদণ্ড আজ কতখানি ভেঙে যাচ্ছে, কতখানি অধঃপাতে যাচ্ছে আমি শুধু সেইটুকু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। তাও ছাত্রদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই। থিয়েটার যদি জীবন-সমাজ দর্শন হয়—আর ছাত্ররা যদি সমাজের মেরুদণ্ড হয়েও তারা পথ হারায়, বিভ্রান্ত হয়, বিলাস আর প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে লেখাপড়ার ব্যাপারে অবহেলা করে, নাট্যকার হিসেবে নাটকের মধ্য দিয়ে তাদের সংযত করা, তাদের সুন্দর পথে চালিত করা আমার কর্তব্য—, সুতরাং তোমরাও জেনে

রাখ, কারও কোন রাঙা চোখ আমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, তোমরা সে চেষ্টা না করে নিজেদের শুধরোবার চেষ্টা কর, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে—

রাগে-উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে ছাত্ররা চলে গেল।

অমর দত্ত এবার ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকার দপ্তরে গিয়ে ঢুকলেন। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথের পাশে।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, ছাত্ররা তোমার থিয়েটারের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা দিয়ে আমার কাছে অনেকগুলি পত্র দিয়ে গেল, আমি এগুলি প্রকাশ করবো, আর এই পত্রগুলির প্রতিবাদ যদি তুমি করতে চাও লিখিত দিও। আমি তাও ছাপবো। এবার বলো দিকিনি, তোমার ওপর ছাত্রদের এত রাগ কিসের?

নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অমরেন্দ্রনাথ অনেকটা ভারাক্রান্ত। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অমরেন্দ্রনাথ বললেন, আপনি আমাকে আপনার ছেলের মতো স্নেহ করেন, ভালবাসেন আমি জানি, তাই সব কথাই আমি আপনাকে বলতে চাই।

দেখুন শুধ্ ছাত্ররা কেন, আমার ওপর চিরদিনই অনেক বড় বড় মানুষই তো বিরূপ। আসলে আমি ছাত্রদের নানাভাবে উপকার করেছি, সমাজের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তাদের আসল জায়গায় খোঁচা দিয়েছি তাই তো আমার অপরাধ—

কথা বলতে বলতে অমরেন্দ্রনাথ একটু একটু করে উত্তেজিত হতে থাকলেন। বললেন, ছাত্রেরা যখনই আমার কাছে চাঁদা চেয়েছে আমি তখনই চাঁদা দিয়েছি, যা অন্য কারও কাছ থেকে তারা কোনদিনই আশা করতে পারবে না। যখনই ছাত্ররা এসে আমার কাছে তাদের প্রয়োজনে থিয়েটার চেয়েছে আমি কোন রকম ভাড়া না নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি, এমন কি তারা গ্যাসের খরচও কখনো দেয়নি। আপনি তো জানেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন 'হ্যামলেট' হয়, ওরা

আমার কাছে এসে দাঁড়াতেই নিঃস্বার্থে প্রয়োজনীয় সব কষ্টিউমস্ এমন কি সীন পর্যন্ত ব্যবহার করতে দিয়েছি। এই তো সেদিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী জেমস্ সাহেব কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে আমার কাছে গিয়ে বললেন, ছোট লাটবাহাদুরের সামনে তারা 'ম্যাকবেথ' নাটক করবে, সমস্ত পোষাক, দৃশ্যপট চাই, আমি হাসিমুখে দিয়েছিলুম। থিয়েটারের দিন আমি নিজে সেই ম্যাকবেথ দেখতে গিয়েছিলুম দর্শক হয়ে—

বাধা দিলেন নরেন্দ্রনাথ, বললেন, বাকিটুকু আমি জানি। ব্যাপারটা আমাকেও সেদিন কম আঘাত করেনি অমর। আমি অবশ্য পরে জেমস্‌কে মুখে ব্যাপারটা বলেছিলুম। বলেছিলুম, মিঃ জেমস্, যে অমর দত্ত'র জন্য আজ তোমরা এই নাটক করতে পারলে, যে অমর নিঃস্বার্থভাবে তোমাদের সব কিছু দিয়ে সাহায্য করল, থিয়েটারের শেষে, ছোট লাটবাহাদুরের সামনে একমাত্র তাকে ছাড়া বাকি সকলকেই অভিনন্দন জানালে, এটা বড় দৃষ্টিকটু। যে এতটা স্বার্থত্যাগ করল, তাকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গেলে—

এবার অমরেন্দ্রনাথের দু'চোখে জল টল টল করে উঠল। ভিতর থেকে তিনি বোধহয় খানিকটা অভিমানী হয়ে পড়লেন। ভাঙা স্বরে বললেন, আমি যে থিয়েটারের লোক, তাই আমি নগণ্য। আমাদের যারা নগণ্য করে আত্মতৃপ্তি পায়, তারা কিন্তু আমাদের কাছে ভিক্ষের হাত পাততে দ্বিধা করে না। লোকচক্ষুর আড়াল থেকে ভিক্ষে চায়, তাই লোকসম্মুখে কৃতজ্ঞতা জানাতে তাদের ভয়—, আমাদের দেশ থেকে এই উঁচু-নীচু ভেদাভেদ, এই জাত-বেজাতের বিচার—এই শিক্ষার নামে অপশিক্ষা যতদিন না ঘুচবে—ততদিন এ জাতের মুক্তি নেই, আর সেদিনও বেশী দূরে নয়। আপনি বিশ্বাস করুন, ছাত্রদের মধ্যে আমি সব সময় একটা বিশাল পৌরুষ দেখতে পাই, ছাত্রদের মধ্যে আগামী দিনের সেই মানুষকে দেখতে পাই, যে মানুষ মানুষের অন্ধকারত্ব ঘোচাবে, তাই সেই ছাত্ররা যাতে মেরুদণ্ডহীন হয়ে না যায়

আমি সেই কথাই শুধু বলেছি আমার নাটকে—অথচ কেউ তা বুঝতে পারেনি, আর এই তার পুরস্কার—

নরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি তোমাকে চিনতে ভুল করিনি, দেশের অনেক মনীষী গোছের মানুষও তোমাকে চিনতে ভুল করেননি, এই বিশ্বাস নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও অমর। এবার বল, আজ হঠাৎ ইণ্ডিয়ান মীরর পত্রিকার দপ্তরে তোমার আসবার হেতু কি—

অমর দত্ত বললেন, আজ আমি ধন্য হয়েছি, আজ আমি জিতেছি জানেন? আমার মনে হয়েছিল আমি যদি আমার দেশের সব প্রণম্য ব্যক্তিদের, রাজা-মহারাজা-রাজকর্মচারী থেকে অভিজাত শিক্ষিত ব্যক্তিদের থিয়েটারে আনতে পারি, যদি তারা থিয়েটার দেখে সুখী হতে পারেন, তাহলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষরাও স্বতস্ফূর্তভাবে থিয়েটার দেখতে চাইবেন। সেদিক থেকে আমি জিতেছি, আমি সকলের দরজায় দরজায় গিয়ে আমার থিয়েটারে তাদের এনেছি। ইতিমধ্যে কাশীর মহারাজা, বর্দ্ধমানের মহারাজা, রাজা রণজিৎ সিং বাহাদুর, আমাদের স্বদেশ-গৌরব প্রণম্য আর, সি. দত্ত, স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, বিজ্ঞান-সাগর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ষ্ট্যানলী, হ্যারিংটন সাহেব এবং আরও অনেকেই আমার থিয়েটারে এসেছেন। ইদানীং তাই থিয়েটারে ভদ্রবংশীয় মহিলা-পুরুষও বিশেষ শ্রদ্ধা নিয়ে থিয়েটারে আসছেন দেখছি। মনে হয় আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আর আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহলে ছোট লাটবাহাদুরকে একবার আমরা থিয়েটারে আনতে পারি। ছোট লাটসাহেব যদি আমার থিয়েটারে পদার্পণ করেন তাহলে ষোলকলা পূর্ণ হয়—, কথা দিন আপনি আমাকে ছোট লাটবাহাদুরের কাছে নিয়ে যাবেন, আমি নিজে তাঁকে অনুরোধ করব—

সব কথা শুনে সেই মুহূর্তে রাজী হলেন নরেন্দ্রনাথ সেন।

একরাশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেদিনকার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথ।

অমরেন্দ্রনাথ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

রাতের পর রাত, দিনের পর দিন নাটক লেখা আর থিয়েটার-থিয়েটার করে শরীরপাত করতে করতে হঠাৎ অচল হয়ে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথ।

খবরটা পৌঁছে গেল সর্বত্র। এমন কি অসুস্থ, রোগশয্যায় শায়িতা হেমনলিনীর কানেও খবরটা পৌঁছে যেতে দেরী হলো না। খবর পেয়ে অস্থির হয়ে পড়ল হেমনলিনী।

সেই মুহূর্তে স্বামীর কাছে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল সে। কিন্তু উপায় নেই। এ বাড়ীর সবগুলো দৃষ্টি যেন অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে রেখেছে তাকে। একমাত্র পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনমতেই স্বামীর কাছে যাওয়া সম্ভব নয় হেমনলিনীর পক্ষে। আর সেই পথই সে খুঁজছিল মনে মনে।

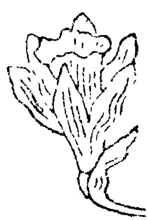
ওদিকে বাগানবাড়ীতে ডাক্তারের নির্দেশ হয়েছে রুগীর জন্য ভাল নার্সিং দরকার। এই সময়ে রোগীকে প্রায় সব সময়ের জন্য চোখে চোখে রাখা কর্তব্য। এমন একজনের দরকার যে দিনরাত অমরেন্দ্রনাথের পরিচর্যা করবে। শুধু তাই নয়, ডাক্তার নির্দেশ দিলেন অমরেন্দ্রনাথকে এই বাগানবাড়ীর পরিবেশ থেকে যেমন করেই হোক হাতীবাগানের বাড়ীতে পাঠাতে হবে।

বেঁকে বসলেন অমরেন্দ্রনাথ। কোনো উপায়েই তাঁকে রাজী করানো গেল না। পার্শ্বচরেরা অবশেষে ঠিক করলেন হেমনলিনীকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করবেন। সেখানেও বাদ সাধলেন অমরেন্দ্রনাথ। হাতীবাগানের বাড়ীতে হেমনলিনী শয্যাশায়ী তাও

তিনি জানিয়ে দিলেন। অবশেষে ঠিক হলো দলের কোন এক অভিনেত্রীর ওপর অমরেন্দ্রনাথের পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

কে সেই জন! কুসুম। অমরেন্দ্রনাথের অভিনেতা জীবনের এক চরম গ্রন্থী হিসেবে একাধিক নাটকে যে কুসুমকুমারী জড়িয়ে ছিলেন, সেই কুসুমের ওপরেই এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো।

সব শুনবার পরই কুসুমকুমারীর মুখের চেহারাটা কেমন পালটে গেল। কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল অভিনেত্রীর অভিব্যক্তি। রাজী হল কুসুম। সেবার নামে এই বিরাট মানুষটির কাছে দিনরাত থাকতে পারলে অনায়াসেই কিছু উপরি আয় করা যাবে, চাই কি গোটা মানুষটাকেই ভালবাসার জালে জড়িয়ে নিয়ে তাঁরই অর্থে স্বপ্নের সৌধ গড়া যাবে—সেই মন নিয়েই রাজী হয়ে যাওয়া। অসুস্থ অমরেন্দ্র-নাথের সব দায়িত্ব হাসি মুখে তুলে নিল সে।



সব কিছু উপেক্ষা করে পথে নেমে এল হেমনলিনী।

দীর্ঘ দিনের অসুস্থ-দুর্বল শরীরটাকে অতি কষ্টে টানতে টানতে নিয়ে এসে বাগমারীর বাগানবাড়ীর যে ঘরে অসুস্থ স্বামী শুয়ে আছেন ঠিক সেই ঘরের দরজায় আছড়ে পড়ল। একটা শব্দ উঠল।

চমকে উঠল কুসুম। ছুটে এল ঘরের বাইরে। ততক্ষণে মাটি থেকে রক্তশূন্য ক্ষীণ দেহটা টেনে তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে হেম। নিতান্ত বালক বিজয়েন্দ্রনাথের কাঁধে ভর দিয়ে একটু একটু করে সে যখন স্বামীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখন স্পষ্ট আলোয় তাকে চিনতে অসুবিধে হলো না কুসুমকুমারীর। গৃহস্থ বধূর সঙ্গে ওদের

কোথায় যেন বিরাট অমিল। এই অমিলই মুহূর্তে তৈরী করতে পারে অমরেন্দ্রনাথের সংগে দুস্তর ব্যবধান। তা হতে পারে না। হেমনলিনীকে দেখে তাই নটীর দু'চোখের মণিতে যেন দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। দু'হাতে দরজা আগলে রেখে হেমের গতিরোধ করল কুসুম। হেমনলিনী ব্যাপারটাকে সহজ করেই নিল। কথা বলার সামর্থ যদিও তার ছিল না, তবুও অতি ক্ষীণস্বরে সে বলল, আমি হেম, ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করব—

রুক্ষ স্বরে জবাব দিল কুসুম, দেখা হবে না, ডাক্তারের নিষেধ—

হেমনলিনী অনুনয় করল। দুর্বল শরীর নিয়ে কুসুমকুমারীর পায়ের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে আকুতি জানাল হেম। তবুও নটীর পাষাণ মনে এতটুকুও রেখাপাত করল না। হেমনলিনী দু'চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আবার বলল, উনি আমার স্বামী, আমি হেম, আমি অসুস্থ, হয়তো আর বাঁচব না। আপনি ওঁকে বলুন হেম এসেছে, আমাকে শেষবারের মতো একবার দেখতে দিন আমার স্বামীকে—

কথাগুলো যেন পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল, কোন রেখাপাত করল না, কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আর এক নটী, সে তারা। তারাসুন্দরী। একজন সামান্য অভিনেত্রীর পায়ের কাছে পড়ে থাকা হেমনলিনীর আকুতি তারাসুন্দরীকে যেন চাবুক মারল। কেঁপে উঠল তারা। এগিয়ে এল হেমনলিনীর কাছে। দু'হাত দিয়ে মনের গভীরতম ভালবাসায় মাটি থেকে তার রক্তশূন্য দেহটা টেনে তুলে নিল সে। বলল, আসুন, আমিই আপনাকে আপনার স্বামীর কাছে নিয়ে যাব—

হেমনলিনী একরাশ কৃতজ্ঞতায় পরম নিশ্চিন্তে তারার কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে একটু একটু করে এসে দাঁড়াল স্বামীর পাশে। স্বামীর পায়ের ওপর হাত রেখে হেমনলিনী অতি কষ্টে বলল, আমি তোমার কাছে এসেছি, তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব বলে এসেছি—

অসুস্থ অমরেন্দ্রনাথও ক্ষীণ স্বরে বললেন, এখনও সময় আসেনি হেম, আমার জীবনের সব গতি যেদিন থেমে যাবে ঠিক সেইদিন আমি তোমার কাছে যাব। জানো হেম, আমি এখন একা নই, আমার মুখ চেয়ে আছে আমার সাধের থিয়েটার, অনেকগুলো মানুষ— ওদের ভাসিয়ে দিয়ে আমি যেতে পারি না, তুমি ফিরে যাও হেম—

হেমনলিনী রীতিমতন পাগলের মতো আবার সেই আকৃতি নিয়ে ছুটে গেল সেই কুসুমকুমারীর কাছে, ছুটে গেল তারার কাছে, ছুটে গেল বাকি সকলের কাছে। প্রত্যেকের হাত ধরে অনুনয় করে বলল, ভিক্ষে দিন, দয়া করে আপনারা আমার স্বামীকে ভিক্ষে দিন, আমি কথা দিচ্ছি, আবার উনি ফিরে আসবেন,—আমি আবার ওঁকে ফিরিয়ে দেব—

শেষ পর্যন্ত জয় হল হেমনলিনীর। বাগানবাড়ীর সকলের সাহায্যে অসুস্থ স্বামীকে হাতিবাগানের বাড়ীতে নিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে।

অসুস্থ শরীর নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে স্বামীর সেবা করে চলল হেমনলিনী। এমনি করে একটার পর একটা বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতে থাকল সে। এমনি করেই হয়তো নিজেকে নিঃশেষ করে দিতেই চেয়েছিল হেমনলিনী। কিন্তু এ ভাবে বেশীদিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না সে। স্বামী-সেবার ক্ষমতাটুকুও এক সময় চলে গেল। এখন একই ঘরে পাশাপাশি রোগশয্যায় শায়িত দুটি জীবন। সাধ মিটল হেমনলিনীর।

দেহ থেকে মাথা বাদ দিলে যেমন দেহের কোন অর্থ থাকে না, তেমনি থিয়েটার থেকে মধ্যমণি সরে গেলে সেই থিয়েটারেরও কোন অর্থ থাকে না।

অমরেন্দ্রনাথের দীর্ঘ অসুস্থতাহেতু তেমনি অর্থহীন হয়ে গেল ক্লাসিক থিয়েটার। বিডন স্ট্রীট কেশরী নামে যে মানুষটিকে সবাই

সম্মান জানিয়েছিল, সেই বিডন স্ট্রীট কেশরী বাদে গোটা বিডন স্ট্রীটই অন্ধকার হয়ে গেল। সুযোগ নিল অন্য থিয়েটারের কর্ণধারেরা। বেশী অর্থের লোভ দেখিয়ে অমরেন্দ্রনাথের গড়া থিয়েটারের পাকা-পাকা অভিনেতা-অভিনেতৃদের বার করে নিয়ে গেল তারা।

সময় মতো পত্রিকা প্রকাশিত হয় না, গ্রাহকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। থিয়েটারের দরজা বন্ধ। আর এদিকে খাঁচায় আটকে থাকা বিডন স্ট্রীট কেশরী অমরেন্দ্রনাথ রোগশয্যায় শুয়েও দুশ্চিন্তার ভারে মুক্তির আকুলতায় ছটফট করে চলেছেন।

একটু সুস্থ হয়ে উঠে ঠিক যে সময়ে অমরেন্দ্রনাথ তাঁর থিয়েটারে যাবেন মনে মনে ভাবছেন, সুযোগ খুঁজছেন, ঠিক সেই সময়ে আর এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের খবর এসে পৌঁছুল তাঁর কানে। থিয়েটারের ম্যানেজার কয়েক হাজার টাকা তছরূপ করে আত্মগোপন করেছে। নিজেকে আর কোন মতেই সংযত করে রাখতে পারলেন না অমরেন্দ্রনাথ। সবার দৃষ্টি এড়িয়ে দুর্বল শরীরে বাড়ী থেকে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সোজা এসে দাঁড়ালেন থিয়েটারে। ক'টা দিনের মধ্যে বুকের রক্তে গড়া থিয়েটারের এই ভগ্নদশা দেখে দু'চোখে জল নেমে এল তাঁর। একটা শ্মশানপুরীতে যেন একাকী সর্বহারা অমরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। মাত্র ক'দিন আগে এই মানুষটির প্রতি হাজার হাজার কণ্ঠে অভিনন্দন ছড়িয়ে পড়ত, এই মুহূর্তে সেই মানুষটিই যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন হাজার হাজার কণ্ঠে কারা যেন চিৎকার করে তাঁর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলছে, তুমি হেরেছ অমর, তুমি হেরেছ। নিস্তব্ধ রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে উন্মাদপ্রায় অমরেন্দ্রনাথ বুকফাটা চিৎকার করে উঠলেন, না না, আমি হারিনি, আমি হারতে জানি না—

থিয়েটারের ভাঙা রাজসিংহাসনে টলে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।



সুতীব্র গতিতে ট্রেনটা চলে গেল।

কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়ে সুদূর বোম্বাই-এর পথে চলে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। এক বন্ধুর বাড়ীর দরজায় বারকতক আঘাত করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দরজা খুলে অমরকে দেখে খুশিতে বন্ধু টলমল করে উঠল। পরক্ষণেই অমরেন্দ্রনাথের ভগ্ন স্বাস্থ্য তাকে আঘাত করল অনেকখানি।

অমরেন্দ্রনাথ বন্ধুর হাত দু'খানা ধরে আকুতি জানালেন, একটা যেমন তেমন কাজ আমাকে জোগাড় করে দাও ভাই, তা না হলে আমি মরে যাব, বাঁচব না—

বন্ধুটি একটা চাকরির প্রতিশ্রুতি দিল।

মাত্র ক'টা দিন। শুরু হয়ে গেল অমরেন্দ্রনাথের চাকরি জীবন। একদিন যে মানুষটির অভিনয়ে মুহুর্মুহুঃ করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠত আজ সেই বিরাট মানুষটি, সেই বিডন স্ট্রীট কেশরী মাথা গুঁজে হিসেব কষে যাচ্ছেন।

পলাতক অমরেন্দ্রনাথ।

যখন জানাজানি হয়ে গেল অমরেন্দ্রনাথ পলাতক—ঠিক তখনই হেমনলিনীর সব কথা হারিয়ে গেল। সে মূক হয়ে গেল। ধীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ সকলেই অস্থির হয়ে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথের জন্য।

সক্রিয় হয়ে উঠলেন পূর্ণবাবু আর পাঁচকড়িবাবু। সকলের দরজায় দরজায় ছুটে বেড়ালেন তাঁরা। সকলকেই ডেকে অনুনয়

করলেন, যেমন করেই হোক অমরেন্দ্রনাথের সাধের থিয়েটারকে আবার আপনারা বাঁচান, আবার তাঁর সাজানো বাগান তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিন। আমরা তাঁর পাশে আছি জানতে পারলে তিনি যেখানেই থাকুন থিয়েটারের টানে আবার তিনি ফিরে আসবেন। অমরেন্দ্রনাথের সঠিক ঠিকানাও পাওয়া গেল। অনেকেই রাজী হলেন। সকলে মিলিতভাবে থিয়েটারকে আবার নতুন করে সাজালেন। থিয়েটারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলে ছুটে গেলেন পুরোহিত অমরেন্দ্রনাথের কাছে। অভিমানী অমরেন্দ্রনাথ ওঁদের দেখে প্রথমটা উত্তেজিত হলেন বটে, কিন্তু নিজেকে আবার সহজ করে নিলেন। ফিরে এলেন অমরেন্দ্রনাথ।

আবার শুরু করে দিলেন থিয়েটার গড়া। আবার প্রাণহীন মঞ্চ জেগে উঠল। আবার সেই একের পর নাটকের সাফল্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অমরেন্দ্রনাথের খ্যাতি। উল্কার মতো ছুটে চললেন তিনি।

এইভাবে একদিন হঠাৎ ছুটতে ছুটতে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথ। আত্মবিশ্লেষণ। দুরন্ত অমরেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন ফিরে যাবেন আপনজনদের কাছে। ফিরে যাবেন হেমনলিনীর পাশে। সংসার অলিন্দে ফিরে গিয়ে এক মধুময় জগৎ গড়ার স্বপ্ন দেখলেন তিনি। নিজেকে প্রস্তুত করলেন সেই মতো। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডন করে সে সাধ্য কার আছে?

অমরেন্দ্রনাথও পারলেন না ভাগ্যের লিখনকে ছিঁড়ে ফেলতে।

সেদিন থিয়েটার চলছিল। মঞ্চে তখন অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করে চলেছেন। দর্শকরা একাত্ম হয়ে গেছে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে। এমন সময় অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে এল। জোর করে অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকলেন তিনি। গলা থেকে রক্ত বেরিয়ে এল তাঁর। অনেক রক্ত। রক্তে পোশাকের অনেকটা অংশ লাল হয়ে গেল। বন্ধ হল অভিনয়। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে এল বাগানবাড়ীতে। ডাক্তার এল।

দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। হাতীবাগানের বাড়ীতে পৌঁছে গেল সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা। হেমনলিনীর কানেও গেল। কিন্তু সে মুখর হতে পারল না। ডাক্তার এবং বাড়ীর সকলেই তখন হেমনলিনীকে নিয়ে বিব্রত। যে কোন মুহূর্তে তার জীবন বেরিয়ে যেতে পারে। স্বামীর এই অসুস্থতার খবরে হেমনলিনীর রক্তশূন্য ঠোঁটজোড়া তার ভিতরকার কান্নায় শুধু কাঁপতে লাগল।

ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, অমরবাবুর সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার। খোলা আকাশের নীচে মুক্ত বাতাসের ভিতরে রাখতে হবে রুগীকে। এক্ষেত্রে নৌকাবিহারই সবচেয়ে ভাল পন্থা।



অমরেন্দ্রনাথের থিয়েটারের বন্ধুরা ছুটে এলেন।

ছুটে এলেন হাতীবাগানের বাড়ীতে ধীরেন্দ্রনাথের কাছে। অমরেন্দ্রনাথকে বাঁচাতে হলে নৌকাবিহারের প্রয়োজন, আর সে ব্যাপারে খরচও অনেক। ধীরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সেই অর্থ সাহায্য চাইলেন বন্ধুরা।

রাজী হলেন ধীরেন্দ্রনাথ। বজরা সাজানো হল। খোলা পাটাতনের উপরে বসলেন অমর। ডাক্তারের নির্দেশ শুধু নিরস নৌকাবিহার নয়, অমরেন্দ্রনাথ যা যা পছন্দ করেন তার সব কিছুই রাখতে হবে নৌকাবিহারে।

তাই হল। তারপর যথাসময়ে অসুস্থ অমরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গঙ্গার বুকে ভাসল সেই বজরা।

বজরা চলছে নৃত্যের ছন্দে যেন ছন্দ মিলিয়ে। যে কথা দিয়ে কাহিনীর শুরু করেছিলাম এখানে সেই একই সুরের রেশ। প্রথমের সেই অমর দত্ত এখানে আরও বেশী নির্বাক। নির্বাক শ্রোতার মতো। শ্রোতা যেমন কান পেতে কথা, সুরের রস আহরণ করে, অমরেন্দ্রনাথ যেন অন্তর্দৃষ্টিতে জীবনের রঙ্গশালার শেষ অংকের অভিনয় দেখতে দেখতে এই মুহূর্তে বড় একাকী। তাঁর বুকের ভিতরে যেন ছুটির ঘণ্টা বাজছে তখন—

হঠাৎ অমরেন্দ্রনাথ বুকটাকে শক্ত করে চেপে ধরে বলে উঠলেন, দোহাই তোমাদের, বজরার মুখ ঘোরাতে বল, বজরার মুখ ঘোরাও—

বজরাটা ঘাটে এসে ভিড়ল।

অমরেন্দ্রনাথের নিস্তেজ দেহটাকে বন্ধুরা আস্তে আস্তে টেনে তুলে নিল। কথা রাখলেন অমরেন্দ্রনাথ। একটি ফসিলের কাছে এসে দাঁড়াল আর একটি ফসিল।

জীবনের একান্ত আপনজনের কাছে এই প্রথম এমন আপনার মতো এসে দাঁড়ালেন অমরেন্দ্রনাথ। বন্ধুরা ওঁকে ধরাধরি করে এনে দাঁড় করিয়ে দিল হেমনলিনীর পাশে।

হেমনলিনী শুয়ে আছে পালঙ্কে। শুয়ে আছে বলাটা ঠিক নয়, পালঙ্কের ওপরে যেন পড়ে আছে হেমনলিনীর কঙ্কালটা একরাশ ব্যথা নিয়ে। আকাশের দিকে চোখ মেলে শুয়ে আছে। মণিজোড়া স্থির, অচঞ্চল। ফ্যাকাসে একটা শুকনো হাত পড়ে আছে বুকের ওপরে, একগাছা সোনার চুড়ি শুধু চিক চিক্ করছে সেই হাতে।

অমরেন্দ্রনাথেরও দু'চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, সব আলো যেন নিভে গেছে। অতি কষ্টে হেমনলিনীর মুখটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলেন অমরেন্দ্রনাথ। সেই মুহূর্তে একটা অবসন্ন মনের কাছে আর একটা অবসন্ন মন যেন দুর্নিবার গতিতে ছুটে যেতে চাইছিল। যেতে

পারল না। যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা আর একটা মৃত ইচ্ছার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে। দুটো মন মিলতে পারল না।

অমরেন্দ্রনাথের দুর্বল হাতটা থর থর করে কাঁপছিল। হেমনলিনীর হাতটা স্পর্শ করার তাগিদে কাঁপা কাঁপা হাতটা অনেকটা কাছে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি। স্পর্শ করা হল না।

মৃত্যু কখন যে হেমনলিনীকে কেড়ে নিয়েছিল তা কেউ জানে না, কিন্তু এই মুহূর্তে অমরেন্দ্রনাথের হাতটাকে বোধ করি ঐ মৃত্যু স্তব্ধ করে দিল।

অমরেন্দ্রনাথ আর হেমনলিনী এই মুহূর্তে পাশাপাশি দু'টি নীরব ভাষা!

এ জন্মের মতো একটা ব্যবধান থেকেই গেল!!